পঞ্চম অধ্যায়

শৈবাল ও ছত্রাক

ALGAE AND FUNGI

প্রধান শব্দসমূহ : শৈবাল, ছত্রাক, লাইকেন

পাশের চিত্র দু'টির প্রতি লক্ষ্য করো। এমন চিত্র কোথাও দেখেছো কি? মাধ্যমিক শ্রেণিতে এ সম্বন্ধে তোমরা কিছুটা জেনেছো। এর কোনটি শৈবাল আর কোনটি ছত্রাক বলতে পারো কি?

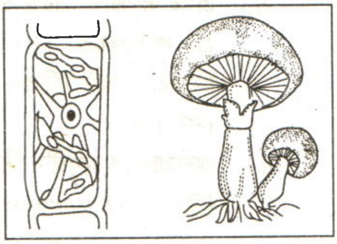

মাধ্যমিক শ্রেণিতে তোমরা *Spirogyra* শৈবাল এবং *Agaricus* ছত্রাক সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা লাভ করেছো। এরা উভয়ই অপুষ্পক উদ্ভিদ, তবে এদের মধ্যে অমিলও কম নয়। শৈবাল উদ্ভিদে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে, তাই এরা সবুজ এবং সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রস্তুত করতে সক্ষম এবং স্বভোজী। ছত্রাক উদ্ভিদে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে না, তাই এরা বর্ণহীন এবং খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না এবং এরা মৃতজীবী বা পরজীবী। নিচে শৈবাল ও ছত্রাক সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনা করা হলো।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে শিক্ষার্থীরা যা যা শিখবে—	পাঠ পরিকল্পনা	
❖ শৈবালের বৈশিষ্ট্য, গঠন, জনন ও গুরুত্ব।	পাঠ ১	শৈবাল : বৈশিষ্ট্য ও গঠন
❖ *Ulothrix* এর আবাস, গঠন ও জনন।	পাঠ ২	শৈবালের জনন ও গুরুত্ব
ব্যবহারিক :	পাঠ ৩	*Ulothrix* (ইউলোথ্রিক্স)
o *Ulothrix* এর স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ করে শনাক্তকরণ ও অঙ্কন।	পাঠ ৪	**ব্যবহারিক :** *Ulothrix* এর স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ
❖ ছত্রাকের বৈশিষ্ট্য, গঠন, প্রজনন ও গুরুত্ব।	পাঠ ৫	ছত্রাক : বৈশিষ্ট্য ও গঠন
❖ *Agaricus* এর গঠন (চিত্রসহ)।	পাঠ ৬	ছত্রাকের জনন ও গুরুত্ব
ব্যবহারিক :	পাঠ ৭	*Agaricus* : গঠন ও ব্যবহারিক
o *Agaricus* এর ফ্রুটবডি শনাক্তকরণ।	পাঠ ৮	ছত্রাকঘটিত রোগ : আলুর বিলম্বিত ধ্বসা রোগ
❖ ছত্রাকঘটিত রোগের কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার।	পাঠ ৯	ছত্রাকঘটিত রোগ : দাদ রোগ বা Ring worm
❖ শৈবাল ও ছত্রাকের সহাবস্থান বিশ্লেষণ।	পাঠ ১০	লাইকেন : গঠন, শ্রেণিবিন্যাস, অন্তর্গঠন ও গুরুত্ব

৫.১ : শৈবাল (Algae)

পৃথিবীতে বহু প্রকার শৈবাল জন্মে থাকে। এদের কতক এককোষী, কতক বহুকোষী। এদের মধ্যে কতক স্থলজ, কতক অর্ধবায়বীয় এবং অধিকাংশই জলজ। এরা মিঠা পানিতে এবং লোনা পানিতে জন্মাতে পারে। শৈবালের হাজার হাজার প্রজাতির মধ্যে আকার, আকৃতি, গঠন ও স্বভাবে প্রচুর পার্থক্য আছে। আকার, আকৃতি ও গঠনে বহু পার্থক্য থাকলেও কতিপয় মৌলিক বৈশিষ্ট্যে এরা সবাই একই রকম, তাই এরা সবাই **শৈবাল** বা **শেওলা** নামে পরিচিত। সম্পূর্ণ ভাসমান শৈবালকে **ফাইটোপ্লাঙ্কটন** বলে। জলাশয়ের পানির নিচে মাটিতে আবদ্ধ হয়ে যে শৈবাল জন্মায় তাদেরকে **বেনথিক শৈবাল** বলে। পাথরের গায়ে জন্মানো শৈবালকে **লিথোফাইট** বলে। উচ্চশ্রেণির জীবের টিস্যুর অভ্যন্তরে জন্মানো শৈবালকে **এন্ডোফাইট** বলে। **এপিফাইট** হিসেবে এরা অন্য শৈবালের গায়েও জন্মায়। শৈবাল বিষয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা, পরীক্ষণ, নিরীক্ষণ ও গবেষণা করাকে বলা হয় **ফাইকোলজি** (phycology) বা শৈবালবিদ্যা। গ্রিক *Phykos* অর্থ seaweed। seaweedও শৈবাল। শৈবালবিদ্যাকে **অ্যালগোলজি** (Algology)ও বলা হয়। সারা বিশ্বে প্রায় ৩০,০০০ প্রজাতির শৈবাল আছে বলে ধারণা করা হয়। **অত্যন্ত সরল প্রকৃতির সালোকসংশ্লেষণকারী, অভাস্কুলার, সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদ (অধিকাংশই জলজ) যাদের জননাঙ্গ এককোষী এবং নিষেকের পর স্ত্রী জননাঙ্গে থাকা অবস্থায় কোনো ভ্রূণ গঠিত হয় না তাদের শৈবাল বলে।**

জীবজগতে শৈবালের অবস্থান (Position of Algae in Living World)

বেনথাম-হুকারের মতে, শৈবাল একটি **শ্রেণি** যার উপজগৎ **ক্রিপ্টোগ্যামিয়া** (অপুষ্পক উদ্ভিদ) এবং বিভাগ **থ্যালোফাইটা** (সমাঙ্গদেহী)-র অন্তর্গত।

ড. লিন মার্গুলিস-এর মতে, শৈবাল সুপারকিংডম-**ইউক্যারিওটা** এবং কিংডম-**প্রোটকটিস্টা** বা **প্রোটিস্টা**-র অন্তর্গত।

শৈবালের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Algae)

১। শৈবাল সালোকসংশ্লেষণকারী স্বভোজী অপুষ্পক উদ্ভিদ এবং আলো ছাড়া জন্মাতে পারে না।

২। এরা সুকেন্দ্রিক, এককোষী বা বহুকোষী। শৈবালে কখনো সত্যিকার মূল, কাণ্ড ও পাতা সৃষ্টি হয় না, অর্থাৎ এরা **সমাঙ্গদেহী** (থ্যালয়েড)।

৩। এদের দেহে ভাস্কুলার টিস্যু নেই। এদের জননাঙ্গ সাধারণত এককোষী বা বহুকোষী হলেও তাতে কোনো বন্ধ্যা কোষের আবরণী থাকে না।

৪। এদের স্পোরাঞ্জিয়া (রেণুথলি) সর্বদাই এককোষী।

৫। এদের জাইগোট স্ত্রীজননাঙ্গে থাকা অবস্থায় কখনো বহুকোষী ভ্রূণে পরিণত হয় না।

৬। শৈবালের কোষ-প্রাচীর প্রধানত সেলুলোজ নির্মিত।

৭। শৈবালের যৌনজনন আইসোগ্যামাস, অ্যানাইসোগ্যামাস অথবা উগ্যামাস।

৮। দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ শৈবালের সঞ্চিত খাদ্য **শর্করা**; নীলাভসবুজ শৈবালে **গ্লাইকোজেন**।

৯। এরা সাধারণত জলীয় বা আর্দ্র পরিবেশে জন্মায়।

১০। সাধারণত সুস্পষ্ট জনুঃক্রম অনুপস্থিত।

শৈবালের দৈহিক গঠন (Structure of Algae) : পৃথিবীতে বহু ধরনের শৈবাল আছে। এদের আকার, আকৃতি ও গঠনগত পার্থক্য বিদ্যমান। এরা হতে পারে–

১। আণুবীক্ষণিক (যেমন- *Prochlorococcus*) থেকে দীর্ঘদেহী (যেমন–*Macrocystis*, প্রায় ৬০ মিটার পর্যন্ত লম্বা)।

২। সচল এককোষী, যেমন- *Chlamydomonas*। এদের কোষে এক বা একাধিক ফ্ল্যাজেলা থাকে।

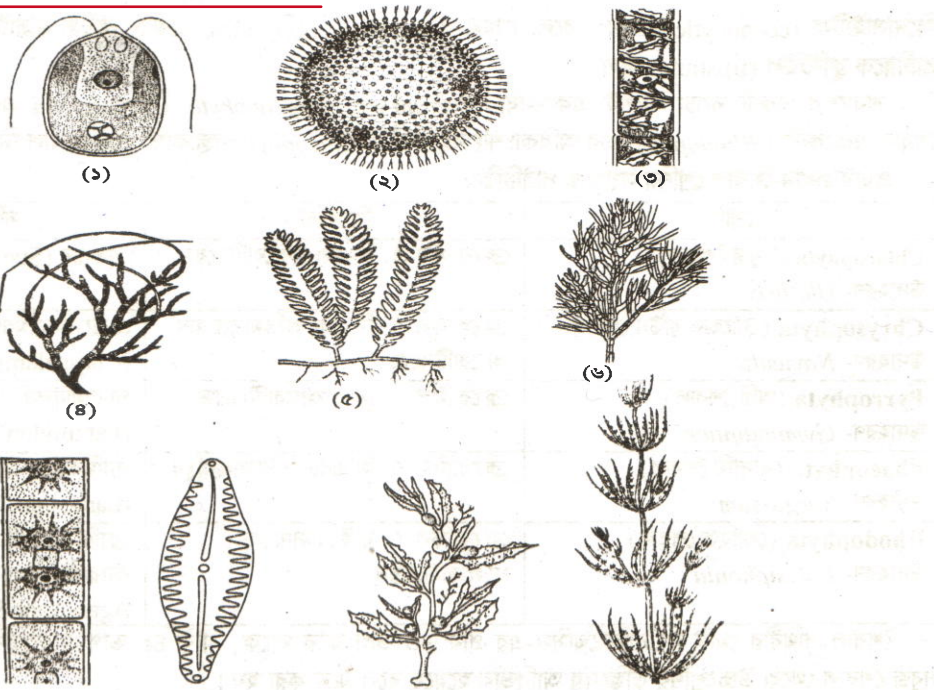

চিত্র ৫.১ : কয়েকটি শৈবাল : (১) *Chlamydomonas*; (২) *Volvox*; (৩) *Spirogyra*; (৪) *Chaetophora*; (৫) *Caulerpa*; (৬) *Polysiphonia* (লোহিত শৈবাল); (৭) *Zygnema*; (৮) *Navicula* (হলদে-সোনালী শৈবাল); (৯) *Sargassum* (বাদামি শৈবাল); (১০) *Chara* (৬, ৮ ও ৯নং ছাড়া অন্যগুলো সবুজ শৈবাল)।

৩। সচল কলোনিয়্যাল, যেমন- *Volvox*, *Pandorina*, *Eudorina*। এরা সিনোবিয়াম। বিশেষভাবে সজ্জিত নির্দিষ্ট সংখ্যক কোষের কলোনি হলো **সিনোবিয়াম**। কোষগুলো পরস্পরের সাথে সাইটোপ্লাজমিক সূত্র দ্বারা যুক্ত থাকে।

৪। নিশ্চল এককোষী, যেমন- *Chlorococcum*, *Chlorella*। এদের ফ্ল্যাজেলা নেই।
৫। বহুকোষী এবং পাতার মতো, যেমন- *Ulva*.
বহুকোষী এবং ফিলামেন্টাস, অশাখ, যেমন– *Ulothrix*, *Spirogyra*.
বহুকোষী এবং ফিলামেন্টাস, শাখান্বিত, যেমন- *Cladophora*, *Chaetophora*.
বহুকোষী এবং হেটেরোট্রাইকাস (শয়ান ও খাড়া অংশে বিভক্ত), যেমন– *Chaetophora*.
৬। সাইফনের মতো (নলাকার), যেমন- *Vaucheria*। এরা সিনোসাইটিক অর্থাৎ কোষ অসংখ্য নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট।
৭। জালের মতো, যেমন- *Hydrodictyon*.
৮। দেহ পর্ব-মধ্যপর্ব সাদৃশ্য, যেমন- *Chara*. [MAT 15-16]
৯। দেহ বাহ্যত মূল, কাণ্ড ও পাতার ন্যায়, যেমন- *Sargassum*.
১০। এদের ক্লোরোপ্লাস্ট হতে পারে সর্পিলাকার (*Spirogyra*), পেয়ালার ন্যায় (*Chlamydomonas*), থালার মতো (*Caulerpa*), জালিকাকার (*Oedogonium*), গার্ডল আকৃতির (*Ulothrix*), তারকার মতো (*Zygnema*)।

শৈবালের কোষীয় গঠন (Cell structure) : সব শৈবালই সুকেন্দ্রিক (eukaryotic)। (আদিকেন্দ্রিক নীলাভ-সবুজ শৈবালকে বর্তমানে সায়ানোব্যাকটেরিয়া হিসেবে অভিহিত করা হয়।) শৈবাল কোষের গঠন মোটামুটিভাবে উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদকোষের মতোই। কোষের বাইরে সেলুলোজ (প্রধান বস্তু) নির্মিত জড় কোষপ্রাচীর, কোষপ্রাচীর দিয়ে পরিবেষ্টিত অবস্থায় কোষঝিল্লি, কোষঝিল্লি দিয়ে পরিবেষ্টিত অবস্থায় সাইটোপ্লাজম থাকে। সাইটোপ্লাজমে বিদ্যমান আছে সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস, বৃহৎ ক্লোরোপ্লাস্ট, মাইটোকন্ড্রিয়া, পাইরিনয়েড, রাইবোসোম ইত্যাদি অঙ্গাণু এবং সঞ্চিত খাদ্য। কোনো কোনো শৈবালের দেহ নলাকার, শাখান্বিত, প্রস্থ প্রাচীরবিহীন এবং কোষে বহু নিউক্লিয়াস থাকে। এরূপ শৈবাল দেহকে **সিনোসাইটিক** (coenocytic) শৈবাল বলে; যেমন–*Vaucheria, Botrydium*. **একটি পূর্ণাঙ্গ ডায়াটমের সিলিকাময় কোষ প্রাচীরকে ফ্রুস্টিউল** (frustiule) **বলে**।

শৈবালের একটি বড়ো অংশই এককোষী। *Pyrrophyta, Euglenophyta, Chrysophyta* এবং বহু *Chlorophyta* শৈবাল এককোষী। *Rhodophyta*-এর অধিকাংশই বহুকোষী, *Phaeophyta* বহুকোষী বৃহৎ শৈবাল নিয়ে গঠিত।

প্রধান প্রধান শৈবাল শ্রেণির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি :

শ্রেণি	পিগমেন্ট	সঞ্চিত খাদ্য
Chlorophyta (সবুজ শৈবাল) উদাহরণ- *Ulothrix*	ক্লোরোফিল এ, বি এবং ক্যারোটিনয়েড	শ্বেতসার (Starch)
Chrysophyta (গোল্ডেন ব্রাউন শৈবাল) উদাহরণ- *Navicula*	ক্লোরোফিল এ, সি এবং অতিমাত্রায় ঘন ক্যারোটিনয়েড	ক্রাইসোল্যামিনারিন (Chrysolaminarin)
Pyrrophyta (অগ্নি শৈবাল) [MAT 19-20] [MAT 17-18] উদাহরণ- *Gymnodinium*	ক্লোরোফিল এ, সি ও ক্যারোটিনয়েড	প্যারামাইলন (Paramylon) [MAT 18-19]
Phaeophyta (বাদামি শৈবাল) উদাহরণ- *Sargassum*	ক্লোরোফিল এ, সি এবং ফিউকোজ্যান্থিন	ল্যামিনারিন, ম্যানিটল ও এলগিন (Laminarin, Mannitol & Algin)
Rhodophyta (লোহিত শৈবাল) উদাহরণ- *Polysiphonia*	ক্লোরোফিল এ, ফাইকোসায়ানিন, ফাইকোইরেথ্রিন	ফ্লোরিডিয়ান স্টার্চ, এগার-এগার ও ক্যারাজীনান (Floridian starch, Agar-Agar & Carrageenan)

শৈবাল পৃথিবীর মোট ফটোসিনথেসিস-এর প্রায় ৬০ ভাগ করে থাকে, বাকি ৪০ ভাগ উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদ করে থাকে। সবুজ শৈবাল থেকে উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদের আবির্ভাব হয়েছে বলে মনে করা হয়।

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে সাগরের পানিকে আলোড়িত করলে আগুন জ্বলতে দেখা যায় যাকে **'Bioluminescence'** বলে। *Pyrrophyta* শৈবালের জন্য এমন হয়ে থাকে। এদের দ্বারাই **রেড টাইড** (red tide) হয়ে থাকে। এসব শৈবালে অবস্থিত luciferin, ATP দ্বারা ফসফোরাইলেটেড হয়, সৃষ্ট বস্তু luciferase এনজাইমের উপস্থিতিতে অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে আলোকশক্তি নির্গত করে। Pyrrophyta শৈবাল একটু ব্যতিক্রমধর্মী। এদের বেশকিছু হেটেরোট্রোফ। এদের ক্রোমোসোমে প্রোটিন কম থাকে, নিউক্লিয়ার এনভেলপের সাথে ক্রোমোসোম যুক্ত থাকে, মাইটোসিস এর সময় নিউক্লিয়ার এনভেলপ বিগলিত হয় না, এমনকি স্পিন্ডল যন্ত্রও সৃষ্টি হয় না।

শৈবালের জনন (Reproduction of Algae)

বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় শৈবালের প্রজনন হয়ে থাকে। নিম্নে এ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

১। অঙ্গজ জনন (Vegetative reproduction) : দৈহিক অঙ্গের মাধ্যমে এ প্রকার জনন হয়ে থাকে। অর্থাৎ স্পোর (spore) বা গ্যামিট (gamete) সৃষ্টি ব্যতিরেকে যে জনন প্রক্রিয়ায় জীবের দৈহিক অঙ্গ থেকে নতুন জীবের সৃষ্টি হয় তাকে **অঙ্গজ জনন** বলা হয়। নিম্নলিখিত উপায়ে অঙ্গজ জনন হতে পারে।

(i) কোষের বিভাজন (Cell division) : এককোষী শৈবালে মাতৃকোষটি দু'ভাগে ভাগ হয়ে দু'টি অপত্যকোষ (daughter cell) তৈরি করে এবং প্রতিটি অপত্যকোষ এক একটি পূর্ণাঙ্গ শৈবাল কোষে পরিণত হয়। উদা.-*Euglena.*

(ii) খণ্ডায়ন (Fragmentation) : বহুকোষী ফিলামেন্টাস শৈবালে যেকোনো কারণে বা যেকোনোভাবে ফিলামেন্টটি ভেঙ্গে গেলে প্রতিটি খণ্ড ক্রমে একটি পূর্ণ শৈবালে পরিণত হয়। উদা- *Nostoc, Ocillatoria*।

(iii) টিউবার সৃষ্টির মাধ্যমে (By formation of tuber) : কোনো কোনো শৈবালের রাইজয়েড বা মাটির নিচের অংশে টিউবার তৈরি হয়, যা পরে পৃথক হয়ে পূর্ণাঙ্গ শৈবালে পরিণত হয়। *Chara* শৈবালে এরূপ হয়।

(iv) কুঁড়ি সৃষ্টি (Budding) : কুঁড়ি (bud) সৃষ্টির মাধ্যমে কোনো কোনো শৈবালে (যেমন-*Protosiphon*) নতুনভাবে পূর্ণাঙ্গ শৈবাল দেহ সৃষ্টি হয়।

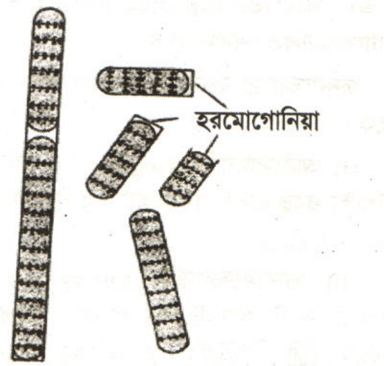

চিত্র ৫.১.১ : *Ocillatoria* শৈবালে খণ্ডায়ন

(v) হরমোগোনিয়া (Hormogonia) : সূত্রাকার নীলাভ-সবুজ শৈবালের ট্রাইকোম খণ্ডিত হলে প্রতিটি খণ্ডকে হরমোগোনিয়াম বলা হয়। আঘাত, সেপারেশন ডিস্ক বা **হেটারোসিস্ট** তৈরির ফলে হরমোগোনিয়া তৈরি হয়। হেটারোসিস্ট হলো দু' প্রাচীরবিশিষ্ট, স্বচ্ছ এবং দেহকোষ হতে বড়ো আকারের কোষ। হেটারোসিস্ট মুক্ত নাইট্রোজেন সংবন্ধন করতে পারে। হরমোগোনিয়া অঙ্কুরিত হয়ে নতুন সূত্র তৈরি হয়; যেমন- *Nostoc, Ocillatoria*। বর্তমানে এরা সায়ানোব্যাকটেরিয়া হিসেবে পরিচিত।

২। অযৌন জনন (Asexual reproduction) : স্পোর সৃষ্টির মাধ্যমে অযৌন জনন ঘটে থাকে। অযৌন জননের একক হলো রেণু বা স্পোর। [MAT 20-21] বিভিন্ন ধরনের রেণু তৈরির মাধ্যমে যে জনন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাকে অযৌন জনন বলা হয়। যেকোনো একটি অঙ্গজ কোষ **স্পোরাঞ্জিয়াম** (sporangium– যে কোষ থেকে স্পোর উৎপন্ন হয় তাকে স্পোরাঞ্জিয়াম বলে) হিসেবে কাজ করে এবং এতে এক থেকে অসংখ্য স্পোর তৈরি করে। স্পোর ফ্ল্যাজেলাবিশিষ্ট ও সচল হলে তাকে চলরেণু বা **জুস্পোর** (zoospore) বলে; যেমন- [MAT 19-20] *Ulothrix*। জুস্পোরগুলো সাধারণত ২–৪ ফ্ল্যাজেলাবিশিষ্ট হয়, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অধিক ফ্ল্যাজেলা থাকতে পারে। স্পোর ফ্ল্যাজেলাবিহীন নিশ্চল হলে তাকে অচলরেণু বা **অ্যাপ্ল্যানোস্পোর** (aplanospore) বলে; যেমন- *Microspora*। চরম প্রতিকূল পরিবেশে অর্থাৎ দীর্ঘ শুষ্ক পরিবেশে অ্যাপ্ল্যানোস্পোর পুরু প্রাচীরবেষ্টিত হলে তাকে **হিপনোস্পোর** (hypnospore) বলে, যেমন- *Ulothrix*। মাতৃকোষের অনুরূপ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অচল রেণুকে **অটোস্পোর** (autospore) বলে; যেমন- *Chlorella*। কতক শৈবালে কোষের পুরো প্রোটোপ্লাস্ট প্রচুর খাদ্য সঞ্চয় করে এবং পুরু প্রাচীর বেষ্টিত হয়, তখন তাকে **অ্যাকাইনিটি** বলে। অনুকূল পরিবেশে অ্যাকাইনিটি অঙ্কুরিত হয়ে নতুন শৈবালে পরিণত হয়, যেমন-*Nostoc, Pithophora, Cladophora*। ডায়াটম জাতীয় শৈবালে বিশেষ ধরনের রেণু সৃষ্টির মাধ্যমে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। এদেরকে **অক্সোস্পোর** বলে; যেমন- *Navicula*। *Nostoc ellipsosporum, Anabaena iyengarii, Aulosira laxa* প্রভৃতি নীলাভ-সবুজ শৈবালে একই সাথে হেটারোসিস্ট এবং অ্যাকাইনিটি থাকে।

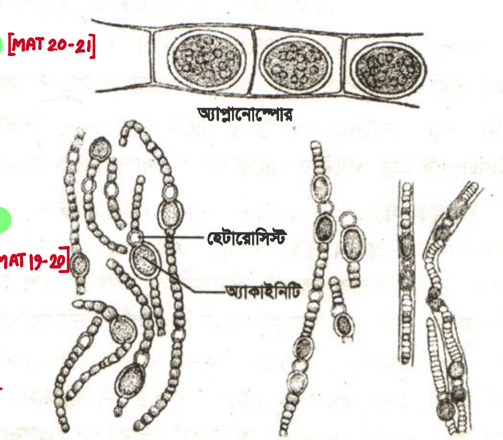

চিত্র ৫.১.২ : শৈবালে অ্যাপ্লানোস্পোর, হেটারোসিস্ট ও অ্যাকাইনিটি

৩। যৌন জনন (Sexual reproduction) : গ্যামিট সৃষ্টি ও দু'টি গ্যামিটের মিলনের মাধ্যমে যে জনন ঘটে তাকে যৌন জনন বলে। শৈবালের যৌন জননের সক্ষমতা অনুসারে এদেরকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে; যথা–

(ক) হোমোথ্যালিক (Homothalic) বা সহবাসী : একই দেহে বিপরীত যৌনধর্মী জননকোষ উৎপন্ন হয় এবং মিলিত হয়ে জাইগোট উৎপন্ন করে তাকে হোমোথ্যালিক শৈবাল বলে। যেমন- *Spirogyra*-র কতক প্রজাতি।

(খ) হেটারোথ্যালিক (Heterothalic) বা ভিন্নবাসী : পুং ও স্ত্রী জননকোষ ভিন্ন ভিন্ন দেহে উৎপন্ন হলে তাদেরকে ভিন্নবাসী বা হেটারোথ্যালিক শৈবাল বলে।

চিত্র ৫.২ : শৈবালের বিভিন্ন প্রকার গ্যামিট্স ও যৌন জনন।

জননকোষের ভিত্তিতে শৈবালে তিন ধরনের যৌন জনন ঘটে থাকে।

(i) আইসোগ্যামি (Isogamy = আইসো = একই রকম) : এ ক্ষেত্রে দু'টি গ্যামিট (স্ত্রী-পুরুষ বা +, −) বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যে হুবহু একই রকম হয়। এ ধরনের গ্যামিটকে আইসোগ্যামিট্স বলে; উদা- *Ulothrix*।

(ii) অ্যানাইসোগ্যামি (Anisogamy = অ্যানাইসো = ভিন্ন রকম) : এক্ষেত্রে একটি গ্যামিট (পুং গ্যামিট) অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার হয় এবং একটি গ্যামিট (স্ত্রী গ্যামিট) অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হয়। এ ধরনের গ্যামিটকে অ্যানাইসোগ্যামিট্স বলে; উদা- *Pandorina*।

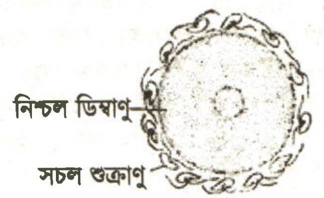

চিত্র ৫.২.১ : *Fucus*-এর উগ্যামাস জনন।

(iii) উগ্যামি (Oogamy) : এক্ষেত্রে স্ত্রী গ্যামিটটি বড়ো ও নিশ্চল হয় এবং সাধারণত স্ত্রী যৌনাঙ্গে অবস্থান করে। পুং গ্যামিট অপেক্ষাকৃত ছোটো ও সচল হয় এবং স্ত্রী জননাঙ্গে স্ত্রী গ্যামিটকে নিষিক্ত করে। এরা হেটেরোগ্যামিট্স; উদা- *Fucus*।

এ তিন প্রকার যৌন জননের মধ্যে আইসোগ্যামি আদি প্রকৃতির এবং উগ্যামি উন্নত প্রকৃতির।

Genus : *Ulothrix* (ইউলোথ্রিক্স)

শ্রেণিবিন্যাস

Division : Chlorophyta
Class : Chlorophyceae
Order : Ulotrichales
Family : Ulotrichaceae
Genus : *Ulothrix*

বাসস্থান : *Ulothrix* সাধারণত মিঠা পানির পুকুর, খাল, বিল, হাওর, নদী-নালা প্রভৃতি জলাশয়ে জন্মে থাকে। খাড়া পাহাড় বা অনুরূপ স্থান যেখানে সর্বদাই পানি পড়ে সেখানেও এরা জন্মে থাকে। *Ulothrix* শৈবালের ৬০টি প্রজাতির মধ্যে অধিকাংশই মিঠা পানিতে জন্মে থাকে, তবে কতক প্রজাতি সামুদ্রিক।

দৈহিক গঠন : *Ulothrix* একটি ফিলামেন্টাস (সূত্রময়) এবং অশাখ সবুজ শৈবাল। ইহা অসীম বৃদ্ধি সম্পন্ন। এর দেহ এক সারি খর্ব ও বেলনাকার কোষ দ্বারা গঠিত। এর গোড়ার কোষটি লম্বাকৃতির, বর্ণহীন এবং নিচের দিকে ক্রমশ সরু, একে হোল্ডফাস্ট বলে। হোল্ডফাস্ট দ্বারা শৈবালটি (বিশেষ করে কচি অবস্থায়) কোনো বস্তুর সাথে আবদ্ধ থাকে। ফিলামেন্টের প্রতিটি কোষের একটি সুনির্দিষ্ট কোষপ্রাচীর আছে। হোল্ডফাস্ট ছাড়া প্রত্যেক কোষে একটি নিউক্লিয়াস আছে, একটি বেল্ট বা ফিতা [MAT-15-16] আকৃতির (girdle shaped) বা আংটি আকৃতির ক্লোরোপ্লাস্ট আছে এবং ক্লোরোপ্লাস্টে এক বা একাধিক পাইরিনয়েড আছে। পাইরিনয়েড হলো প্রোটিনজাতীয় পদার্থের চকচকে দানা, যার চারদিকে অনেক সময় স্টার্চ থাকে। ক্লোরোপ্লাস্টটি কোষকে আংশিকভাবে অথবা সম্পূর্ণভাবে বেষ্টন করে রাখে। হোল্ডফাস্ট ছাড়া অন্য যেকোনো কোষ প্রস্থে বিভক্ত হতে পারে, ফলে ফিলামেন্ট দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

চিত্র ৫.৩ : *Ulothrix* শৈবাল।
(অসীম বৃদ্ধি বোঝানোর জন্য মাঝখানে কেটে দেয়া হয়েছে।)

বাংলাদেশ থেকে *U. simplex*, *U. tenerrima* এবং *U. variabilis* নামক তিনটি প্রজাতি বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে *U. simplex* এর আবিষ্কারক প্রফেসর এ.কে.এম. নুরুল ইসলাম (১৯৬৯)। এটি সম্ভবত বাংলাদেশে এন্ডেমিক।

জনন : *Ulothrix* অঙ্গজ, অযৌন এবং যৌন জনন পদ্ধতিতে বংশবৃদ্ধি করে থাকে।

RMDAC

১। **অঙ্গজ বংশবৃদ্ধি :** খণ্ডায়নের মাধ্যমে এর অঙ্গজ বংশবৃদ্ধি হয়ে থাকে। দৈবক্রমে ফিলামেন্টটি ভেঙ্গে কয়েকটি খণ্ডে পরিণত হলে প্রত্যেক খণ্ড, কোষ বিভাজনের মাধ্যমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে এক একটি নতুন *Ulothrix* রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

২। **অযৌন জনন :** জুস্পোর সৃষ্টির মাধ্যমে *Ulothrix*-এর অযৌন জনন সম্পন্ন হয়। কখনো কখনো অ্যাপ্ল্যানোস্পোর সৃষ্টির মাধ্যমেও অযৌন জনন হয়ে থাকে। জুস্পোরগুলো সাধারণত চার ফ্ল্যাজেলাযুক্ত। যে কোষ হতে জুস্পোর উৎপন্ন হয় তাকে **জুস্পোরাঞ্জিয়াম** বলে। হোল্ডফাস্ট ছাড়া অন্য যে কোনো কোষ হতে জুস্পোর সৃষ্টি হতে পারে। প্রজাতির ওপর নির্ভর করে প্রত্যেক জুস্পোরাঞ্জিয়াম হতে ১–৩২টি জুস্পোর সৃষ্টি হয়। একটিমাত্র জুস্পোর সৃষ্টি হলে কোষের সম্পূর্ণ প্রোটোপ্লাস্টই একটি জুস্পোরে রূপান্তরিত হয়। একাধিক জুস্পোর উৎপন্ন হলে জুস্পোরাঞ্জিয়ামের প্রোটোপ্লাস্ট একটু সংকুচিত হয় এবং লম্বালম্বিভাবে দু'ভাগে বিভক্ত হয়। প্রজাতির ওপর নির্ভর করে ৩২টি অপত্য প্রোটোপ্লাস্ট সৃষ্টি পর্যন্ত এ বিভাজন চলতে পারে। প্রতিটি অপত্য প্রোটোপ্লাস্ট তখন **চার ফ্ল্যাজেলা**যুক্ত জুস্পোরে রূপান্তরিত হয়। সরু কোষের প্রজাতি হতে সৃষ্ট সকল জুস্পোর একই প্রকার হয় কিন্তু মোটা কোষের প্রজাতি হতে দু' প্রকার জুস্পোর উৎপন্ন হয়- (১) ক্ষুদ্রাকৃতির বা **মাইক্রোজুস্পোর**-এর আইস্পট মধ্যখানে থাকে এবং একটি জুস্পোরাঞ্জিয়াম হতে ৮–৩২টি জুস্পোর উৎপন্ন হয়; (২) বৃহদাকৃতির বা **মেগাজুস্পোর**-এর আইস্পট সম্মুখভাগে থাকে এবং একটি জুস্পোরাঞ্জিয়াম হতে ১–৪টি জুস্পোর উৎপন্ন হয়। জুস্পোরগুলো নাসপাতি আকৃতির। একটি ভেসিকল দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় জুস্পোরগুলো জুস্পোরাঞ্জিয়াম প্রাচীরের গায়ে উৎপন্ন ছিদ্রপথে বের হয়ে আসে এবং ভেসিকলের অবলুপ্তির পর এরা মুক্তভাবে ভেসে বেড়ায়। ২–৬ দিন সন্তরণের (সাঁতার কাটার) পর জুস্পোরের ফ্ল্যাজেলাযুক্ত মাথাটি কোনো জলজ বস্তুর সাথে আবদ্ধ হয়। আবদ্ধ হওয়ার পর এরা আস্তে আস্তে ফ্ল্যাজেলাবিহীন হয়, এর চারদিকে একটি প্রাচীর গঠন করে এবং ক্রমে দীর্ঘ হয় ও বিভাজনের মাধমে নতুন *Ulothrix* ফিলামেন্ট সৃষ্টি করে।

চিত্র ৫.৪ : *Ulothrix*-এর অযৌন জনন।

প্রতিকূল পরিবেশে জুস্পোরগুলো জুস্পোরাঞ্জিয়াম হতে নির্গত হয় না, অধিকন্তু এদের চারদিকে একটি প্রাচীর গঠন করে **অ্যাপ্ল্যানোস্পোরে** পরিণত হয়। কখনো কখনো কোনো একটি কোষের সম্পূর্ণ প্রোটোপ্লাস্ট গোলাকার হয় এবং চারপাশে একটি পুরু প্রাচীর গঠন করে **অ্যাকাইনিটিতে** পরিণত হয়। একে হিপনোস্পোরও বলা হয়। প্রচুর সঞ্চিত খাদ্য সম্বলিত যে স্পোরের মাধ্যমে জীব তার প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করে তাকে **রেস্টিং স্পোর** বলে। অনুকূল পরিবেশে এরা এদের পুরু প্রাচীর বিদীর্ণ করে বের হয়ে আসে এবং অঙ্কুরায়ন ও বিভাজনের মাধ্যমে নতুন ফিলামেন্টে পরিণত হয়।

৩। **যৌন জনন :** *Ulothrix* একটি ভিন্নবাসী বা **হেটোরোথ্যালিক শৈবাল** (স্ত্রী ও পুরুষ জননকোষ আলাদা দেহে উৎপন্ন হয়)। *Ulothrix* শৈবাল এর যৌন মিলন **আইসোগ্যামাস**। হোল্ডফাস্ট ছাড়া যেকোনো একটি কোষের প্রোটোপ্লাস্ট বিভাজনের মাধ্যমে ৮–৬৪টি অপত্য প্রোটোপ্লাস্ট সৃষ্টি করে। প্রতিটি অপত্য প্রোটোপ্লাস্ট একটি নাসপাতি আকৃতির **বাইফ্ল্যাজিলেট** গ্যামিটে রূপান্তরিত হয়। গ্যামিটগুলো জুস্পোর হতে ক্ষুদ্রাকৃতির। এদের আইস্পট অত্যন্ত স্পষ্ট। একটি ভেসিকল দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় এরা জননকোষাধার বা **গ্যামিটেঞ্জিয়াম** (যে কোষ হতে গ্যামিট সৃষ্টি হয়)-এর প্রাচীরে সৃষ্ট ছিদ্রপথে বের হয়ে আসে এবং ভেসিকলের অবলুপ্তির পর মুক্তভাবে সাঁতরে বেড়ায়। দু'টি ভিন্ন ফিলামেন্ট হতে দু'টি ভিন্নধর্মী (+, -) গ্যামিট **দেহের বাইরে এসে** যৌন মিলন সম্পন্ন করে এবং একটি চার ফ্ল্যাজেলাযুক্ত ডিপ্লয়েড (2n) **জাইগোট** সৃষ্টি করে। জাইগোট কিছুকাল সচল থাকে, পরে ফ্ল্যাজেলাবিহীন হয়ে পুরু প্রাচীরবিশিষ্ট হয় এবং পরে বিশ্রামকাল (resting

stage) কাটায়। বিশ্রামের পূর্বে এরা প্রচুর খাদ্য সঞ্চয় করে এবং চারদিকে একটি প্রাচীর সৃষ্টি করে। বিশ্রামকাল শেষে এতে **মায়োসিস** বিভাজন হয় এবং ৪–১৬টি হ্যাপ্লয়েড (n) জুস্পোর (প্রতিকূল অবস্থায় অ্যাপ্ল্যানোস্পোর) সৃষ্টি করে। জাইগোট

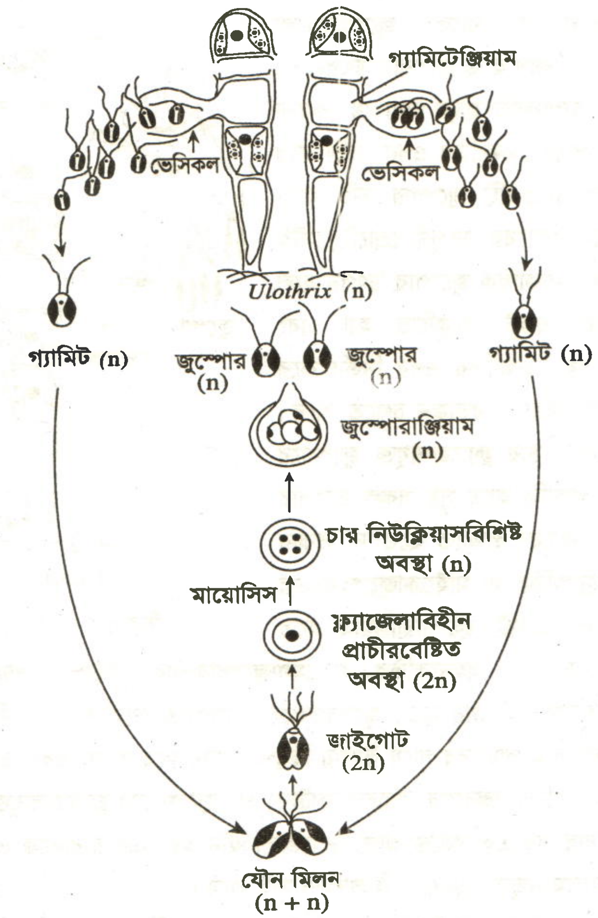

চিত্র ৫.৫ : *Ulothrix*-এর যৌন জনন।

প্রাচীর বিদীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে জুস্পোরগুলো (অথবা অ্যাপ্ল্যানোস্পোর) বের হয়ে আসে এবং অঙ্কুরায়ন ও বিভাজনের মাধ্যমে নতুন উদ্ভিদে পরিণত হয়। *Ulothrix* এর **জীবনচক্র** Haplontic অর্থাৎ বহুকোষী গ্যামিটোফাইটিক জনুর সাথে এককোষী স্পোরোফাইটিক জনুর জনুঃক্রম ঘটে।

[**পামেলা দশা (Palmella Stage) :** কিছু শৈবালের ক্ষেত্রে শুষ্ক পরিবেশে প্রোটোপ্লাজম বার বার বিভাজিত হয়ে মাতৃকোষ প্রাচীরের মধ্যে জেলাটিনে আবদ্ধ থাকে। এ অবস্থাকে পামেলা দশা বলে। সাধারণত *Chlamydomonas* শৈবালে এ অবস্থা দেখা যায়। আবাসস্থলে পানির অভাব দেখা দিলে স্পোর ফ্ল্যাজেলা তৈরি না করে অ্যাপ্ল্যানোস্পোর-এ পরিণত হয়। একটি জেলাটিনের সাধারণ আবরণী দ্বারা আবৃত অবস্থায় উপর্যুপরি বিভাজনের ফলে বহু কোষের সৃষ্টি হয়। আবাসস্থলে পানির প্রবাহ ফিরে এলে জেলাটিনের আবরণটি গলে যায় এবং প্রতিটি কোষ ফ্ল্যাজেলা সৃষ্টি করে জুস্পোর গঠনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ নতুন শৈবালে পরিণত হয়। *Ulothrix*-এ **পামেলা** দশা হতে পারে। এটি একটি অস্বাভাবিক অযৌন জনন প্রক্রিয়া। বহুকোষী ডিপ্লয়েড জনুর সাথে এককোষী হ্যাপ্লয়েড (গ্যামিট) জনুর অনুক্রম ঘটলে তাকে Diplontic **জীবনচক্র** বলে; উদাহরণ– *Fucus, Sargassum*।]

***Ulothrix* শৈবালের গুরুত্ব :** এরা পরিবেশতন্ত্রে উৎপাদক হিসেবে কাজ করে, বায়ুমণ্ডলে O_2 যোগ করে এবং CO_2 শোষণ করে।

Ulothrix

Chlamydomonas

Chlorella

Ulva

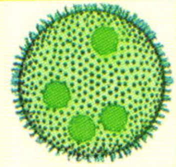

Volvox

Chara

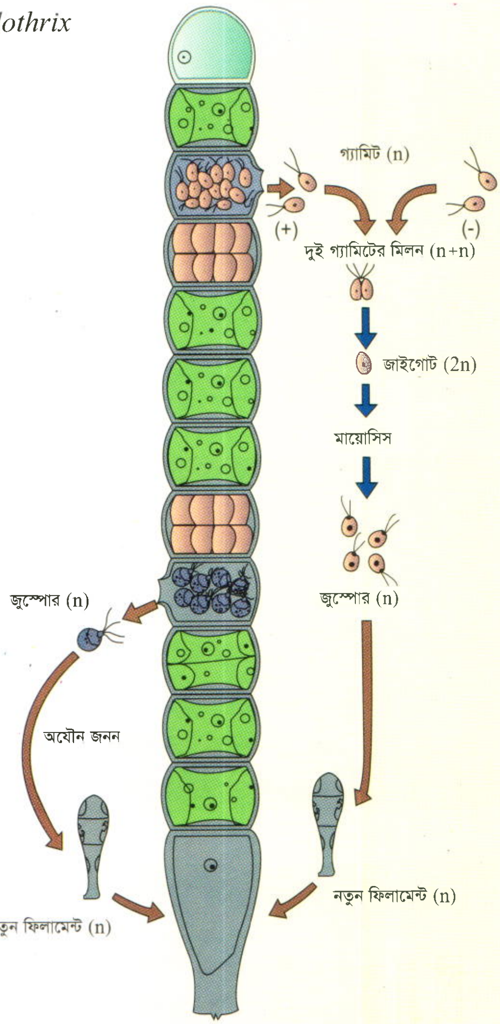

***Ulothrix* শৈবালের Haplontic জীবনচক্র**

চিত্রটি ভালোভাবে লক্ষ কর। হ্যাপ্লয়েড (n) এবং ডিপ্লয়েড (2n) অবস্থা তুলনা করে দেখ। অযৌন ও যৌন জনন অংশ তুলনা কর।

Amanita muscaria

Laetiporus sulphureus

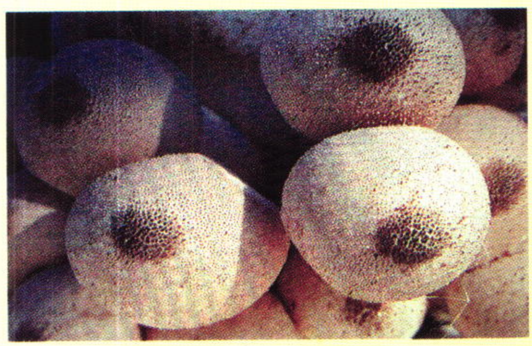

Lycoperdon perlatum

মাশরুম

চিত্র : কয়েকটি পরিচিত শৈবাল এবং কয়েকটি পরিচিত ছত্রাক

বিলম্বিত ধ্বসা রোগে আক্রান্ত আলু গাছের পাতা

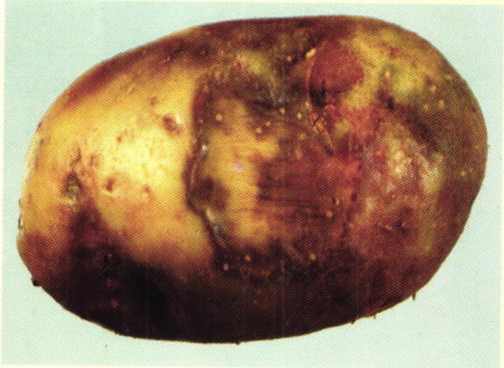

বিলম্বিত ধ্বসা রোগে আক্রান্ত আলু

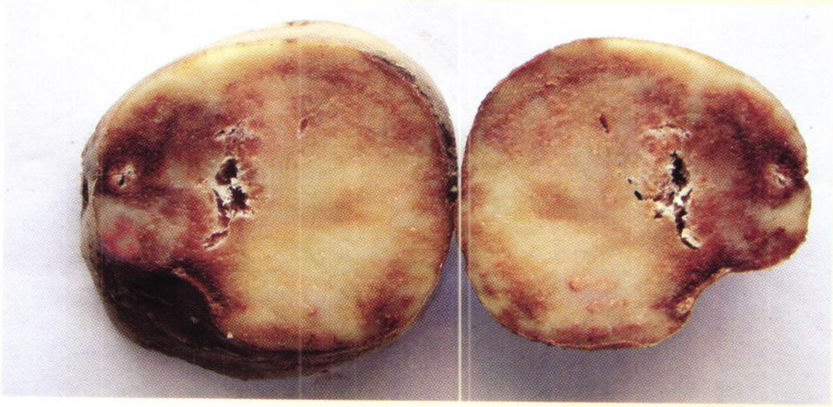

বিলম্বিত ধ্বসা রোগে আক্রান্ত আলুর প্রস্থচ্ছেদ

দাদ রোগে আক্রান্ত ত্বক

দাদ রোগে আক্রান্ত ত্বক

ক্রাসটোজ লাইকেন

ফোলিয়োজ লাইকেন

ফ্রুটিকোজ লাইকেন

শৈবালের অর্থনৈতিক গুরুত্ব (Economic Importance of Algae)

শৈবালের উপকারী দিক বেশি, কিন্তু অপকারী দিকও আছে।

শৈবালের উপকারী ভূমিকা (Beneficial role of algae) : শৈবালের উপকারী দিক বেশি। কয়েকটি উপকারী ভূমিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১। বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন যোগ : শৈবালের সবচেয়ে উপকারী দিক হলো বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন সংযোগ। লক্ষ লক্ষ বছর আগে বায়ুমণ্ডলে কোনো অক্সিজেন ছিল না। নীলাভ-সবুজ শৈবাল প্রথম সালোকসংশ্লেষণ শুরু করে এবং লক্ষ লক্ষ বছরের সালোকসংশ্লেষণের ফলে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন জমা হতে হতে বর্তমান পর্যায়ে (শতকরা প্রায় ২০ ভাগ) আসে। এর পরই উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদ ও প্রাণীর উদ্ভব ঘটে।

২। মাটিতে মুক্ত নাইট্রোজেন সংবন্ধন : *Nostoc, Anabaena, Aulosira* প্রভৃতি নীলাভ সবুজ শৈবাল মাটিতে মুক্ত নাইট্রোজেন সংবন্ধন করে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। এতে ইউরিয়া সার প্রয়োগের পরিমাণ একেবারেই কমে যায়। ধানের জমিতে *Azolla* জন্মালেও জমিতে নাইট্রোজেন সার কম প্রয়োগ করতে হয়; কারণ *Azolla*-র অভ্যন্তরে *Anabaena azolle* নামক নীলাভ সবুজ শৈবালমুক্ত নাইট্রোজেন সংবন্ধন করে।

৩। পরিবেশ দূষণ রোধ : সমুদ্রের বিপুল পরিমাণ শৈবাল সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডল থেকে CO_2 গ্রহণ করে এবং পরিবেশে O_2ত্যাগ করে। মোট সালোকসংশ্লেষণের শতকরা ৬০ ভাগই শৈবালে ঘটে থাকে। ফলে পরিবেশ দূষণ কম হয়।

৪। উৎপাদক হিসেবে : বিভিন্ন জলাশয়ে (স্বাদু পানি এবং লোনা পানি) শৈবাল ফুড চেইন-এর প্রধান উৎপাদক হিসেবে কাজ করে।

৫। বয়োফুয়েল (Biofuel) তৈরি : Biofuel বা Biodiesel তৈরির জন্য বর্তমানে শৈবালকে বেছে নেয়া হয়েছে। তাই শৈবালকে second generation biofuel নামে অভিহিত করা হয়েছে। *Botryococcus braunii* এ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। *Chlorella, Scenedesmus* কেও ব্যবহার করার চেষ্টা চলছে।

৬। গোয়েন্দা সাবমেরিন-এর অবস্থান নির্ণয় : নীলাভ সবুজ শৈবালে অবস্থিত phycobilin protein নামে অতিরিক্ত রঞ্জক কণিকা (C-phycoerythrin, C-phycocyanin) দৃশ্যমান আলোর বাইরের আলোকরশ্মি শোষণ করতে পারে। পানির নিচে গোয়েন্দা সাবমেরিন হতে বিকিরিত বিভিন্ন রশ্মি এরা শোষণ করে নেয় এবং এ শোষিত রশ্মির পরিমাণ থেকে আশপাশে গোয়েন্দা সাবমেরিন-এর অবস্থান জানা যায়।

৭। সমুদ্রে মাছের অবস্থান নির্ণয় : সমুদ্রের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে সময় সময় শৈবালের অধিক বৃদ্ধি ঘটে এবং খাদ্য প্রাপ্তির আশায় মাছ ঐ অঞ্চলে ছুটে আসে। স্যাটেলাইট পর্যবেক্ষণে ঐ অঞ্চলগুলো নির্ণয় করে মাছ ধরার ট্রলারকে অবস্থান নির্দেশ করা হয়, ফলে প্রচুর পরিমাণ মাছ অল্পসময়ে ধরা সম্ভব হয়।

৮। মাটির বয়স নির্ণয় : জলাশয়ের তলদেশে মাটির স্তরে জমাকৃত ডায়াটম খোলস-এর কার্বন ডেটিং করে ঐ মাটির উৎপত্তির বয়স নির্ণয় করা হয়।

৯। মানুষের খাদ্য হিসেবে : প্রাচীনকাল হতে বিভিন্ন প্রজাতির শৈবাল, যেমন- *Ulva lactuca*-কে মানুষ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে আসছে। মানুষের খাদ্য তালিকায় *Chlorella* একটি ভিটামিন সমৃদ্ধ শৈবাল।

১০। পশুখাদ্য হিসেবে : *Laminaria saccharina, Alaria, Rhodymenia* প্রভৃতি শৈবাল ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

১১। শৈবাল থেকে ন্যানোফিল্টার উৎপাদন : ন্যানোফিল্টার হলো এমন ফিল্টার (ছাঁকনি) যা দিয়ে আমাদের শরীরে রোগ সৃষ্টিকারী সকল ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া ছেঁকে ফেলা যায়, তাই পানি হয় সম্পূর্ণভাবে জীবাণুমুক্ত ও ঝুঁকিমুক্ত। এ ফিল্টার তৈরিতে ব্যবহার করা হয় **পিথোফোরা** (*Pithophora*) শৈবাল যার সন্ধান ও কাঁচামাল প্রদান করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের শৈবালবিদ ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেসানী। DAT 23-24

ফিল্টার তৈরির কাজটি করা হয়েছে সুইডেনের উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে Prof. Gustafsoon-এর নেতৃত্বে। *Pithophora* শৈবাল সেলুলোজ সমৃদ্ধ, তাই প্রকৃতপক্ষে এ ন্যানোফিল্টারটি একটি সেলুলোজ ফিল্টার, দেখতে একটি সাদা

কাগজের মতো এবং এর ছাঁকনিগুলোর ফুটো (ছিদ্র) ১৭ ন্যানোমিটার। পানিবাহিত রোগজীবাণুসমূহের আকার সাধারণত ৩০–১০০ ন্যানোমিটার হয়, তাই পানিতে থাকা সবধরনের রোগজীবাণুই এ ছাঁকনিতে আটকা পড়ে যায়।

বাংলাদেশের ভূগর্ভস্থ পানিতে প্রচুর আর্সেনিক আছে, যা শরীরের জন্য বিষাক্ত, তাই আমাদের নির্ভর করতে হবে নদী বা হ্রদের পানির ওপর। আর এ ন্যানোফিল্টার পুকুর, নদী-হাওর-বিলের পানিকে শতকরা ১০০ ভাগ পানের উপযোগী করে দিবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যেকোনো ছাঁকনির ছিদ্র ১৭ ন্যানোমিটারের কম হলে পানিতে থাকা গুরুত্বপূর্ণ আয়ন, লবণ আটকে যাবে কিন্তু এ শৈবাল থেকে তৈরি ন্যানোফিল্টার দিয়ে ছাঁকলে জীবাণু আটকা পড়ে কিন্তু প্রয়োজনীয় আয়ন-লবণ পানির সাথে থেকে যায়। আরো গবেষণার মাধ্যমে এটি সহজতর প্রয়োগমুখী করা সম্ভব হবে।

এ জনগুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক কাজটি ২০১৯ সালের আগস্টে American Chemical Society-র Sustainable Chemistry & Engineering জার্নালে প্রকাশিত হয়। এর মাধ্যমে একজন বাংলাদেশি শৈবালবিদ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেল।

শৈবালের অপকারী ভূমিকা (Harmful role of algae) : শৈবালের অপকারী দিক খুব বেশি নয়। কয়েকটি অপকারী ভূমিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

১। **ওয়াটার ব্লুম (Water bloom) সৃষ্টি :** পুকুর বা জলাধারে পুষ্টির পরিমাণ বেড়ে গেলে কিছু **নীলাভ সবুজ শৈবালের** (বর্তমানে সায়ানোব্যাকটেরিয়া) সংখ্যা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়, যাকে **ওয়াটার ব্লুম** বলে। এতে জলাধারের পানি দূষিত হয়, খাবার ও ব্যবহারের অনুপযোগী হয়। ঐ জলাধারের মাছ মরে যায়। *Ocillatoria, Nostoc, Mycrocystis* এ ধরনের শৈবাল। অবশ্য বর্তমানে এগুলোকে সায়ানোব্যাকটেরিয়া নামে অভিহিত করা হয়।

২। **উদ্ভিদের রোগ সৃষ্টি :** *Cephaleuros virescens* নামক প্রজাতি চা, কফি, ম্যাগনোলিয়া গাছে রোগ সৃষ্টি করে। এতে চা এবং কফির ফলন কমে যায়।

৩। **মাছের রোগ সৃষ্টি :** কোনো কোনো শৈবাল (যেমন- *Oedogonium*-এর কোনো কোনো প্রজাতি) মাছের ফুলকা রোগ সৃষ্টি করে।

৪। **স্থাপনার ক্ষতি :** দেয়ালে শৈবালের অতিবৃদ্ধি দালানের বেশ ক্ষতি করে থাকে।

৫। **রাস্তাঘাট পিচ্ছিলকরণ :** পাকা নদীর ঘাট, পুকুর ঘাট, বাথরুমের মেঝ, পায়ে হাঁটার রাস্তায় জন্মানো নীলাভ সবুজ শৈবালের মিউসিলেজ আবরণ অত্যন্ত বিপদজনক হতে পারে। এতে পা পিছলে পড়ে অস্থিভাঙ্গা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

ব্যবহারিক : *Ulothrix* এর স্লাইড পর্যবেক্ষণ।

উপকরণ : *Ulothrix* এর তাজা নমুনা অথবা স্থায়ী স্লাইড, অণুবীক্ষণযন্ত্র, কাচের বাটি, গ্লিসারিন, স্লাইড, কাভার স্লিপ, নিডল, পানি, ব্যবহারিক শিট, পেন্সিল ইত্যাদি।

কার্যপদ্ধতি : তাজা নমুনা সংগ্রহ করা সম্ভব হলে শিক্ষক কাচের স্লাইডে গ্লিসারিনে নমুনা স্থাপন করে তাতে কাভার স্লিপ দিয়ে অণুবীক্ষণযন্ত্রে স্থাপন করে দিবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে তা পর্যবেক্ষণ করে খাতায় আঁকতে বলবেন।

তাজা নমুনা সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে স্থায়ী স্লাইড কিনে নিতে হবে। ব্যবহারিক ক্লাসে অণুবীক্ষণযন্ত্রে স্থায়ী স্লাইড স্থাপন করে শিক্ষার্থীদেরকে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। শিক্ষার্থীগণ স্লাইড পর্যবেক্ষণ করে ব্যবহারিক সিটে পেন্সিল দিয়ে সঠিক চিত্র আঁকবে। চিত্রটি অবশ্যই চিহ্নিত হতে হবে।

পর্যবেক্ষণ :

(i) এটি অশাখ, লম্বা সূত্রাকার ও সবুজ বর্ণের, (ii) কোষগুলো পিপাকৃতির, দৈর্ঘ্যের তুলনায় প্রস্থে বড়ো, (iii) ক্লোরোপ্লাস্ট বেল্ট, পেয়ালা বা আংটি আকৃতির, (iv) ক্লোরোপ্লাস্টে একাধিক পাইরিনয়েড বিদ্যমান, (v) সূত্রের নিচের কোষটি বর্ণহীন, সরু ও লম্বাটে ধরনের; যাকে হোল্ডফাস্ট বলে।

শনাক্তকরণ : উপরিউল্লেখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের কারণে প্রদত্ত নমুনাটি ক্লোরোফাইসি শ্রেণির *Ulothrix* শৈবাল।

৫.২ : ছত্রাক (Fungi)

প্রচলিত শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতিতে ছত্রাক থ্যালোফাইটা বিভাগের অন্তর্গত কিন্তু পঞ্চরাজ্য (five kingdom) শ্রেণিবিন্যাসে ছত্রাক প্রজাতিসমূহ পৃথক fungi রাজ্যের অন্তর্গত। Fungi (একবচনে fungus)-এর বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে ছত্রাক। সত্যিকার অর্থে ছত্রাক হলো **ক্লোরোফিলবিহীন, বহুকোষী, অভাস্কুলার, হাইফিসমৃদ্ধ মাইসেলিয়াম দ্বারা গঠিত হেটেরোট্রফিক সুকেন্দ্রিক জীব যারা শোষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য গ্রহণ করে।** ছত্রাক সম্বন্ধে স্টাডি করাকে বলা হয় **মাইকোলজি** (Mycology) বা **ছত্রাকতত্ত্ব** (Gk. *Mykes* = fungus = ছত্রাক, *logos* = knowledge = জ্ঞান)। এ পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রায় ৯০,০০০ প্রজাতির ছত্রাক পাওয়া গিয়েছে।

ছত্রাকের বাসস্থান : ছত্রাকের জন্য সন্তোষজনক পরিবেশ হলো আর্দ্রতা, উষ্ণতা, অর্গানিক খাদ্যসমৃদ্ধ ছায়াযুক্ত বা অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা। মাটি, পানি, উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ, পচনশীল জীবদেহ বা দেহাবশেষ সর্বত্রই ছত্রাকের বাসস্থান। স্থলজ ছত্রাকগুলো সাধারণত জৈব পদার্থ, বিশেষত **হিউমাসসমৃদ্ধ** মাটিতে ভালো জন্মে। জলজ ছত্রাকগুলো সাধারণত নিম্নশ্রেণির। এরা পানিতে অবস্থানকারী জীবসমূহের পচনশীল মৃতদেহের ওপর বাস করে। উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে বসবাসকারী বিপুল সংখ্যক ছত্রাক পরজীবী হিসেবে জীবনযাপন করে। কিছু কিছু ছত্রাক আমাদের নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য, গুদামজাত ফলমূল এবং খাদ্যশস্যের ওপর মৃতজীবী হিসেবে বাস করে।

মধু ছত্রাক বা হানি মাশরুম (Honey mushroom- *Armillaria ostoyae*) : পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো জীব হিসেবে গণ্য করা হয়। ধারণা করা হয় এর বয়স প্রায় ২৪০০ বছর এবং প্রায় ২০০০ একর জমির ওপর বিস্তৃত থাকে। এটি বিস্তৃতির সময় বহু বৃক্ষকে নির্মূল করে থাকে। কিছু ছত্রাক যেমন- *Armillaria mellea* অন্ধকারে আলোক বিচ্ছুরণ ঘটায়। কিছু ছত্রাক বিষাক্ত এবং কিছু ছত্রাক এত বিষাক্ত যে এরা মানুষ কিংবা প্রাণীর তাৎক্ষণিক ক্ষতির কারণ হতে পারে। এসব বিষাক্ত ছত্রাকে **অ্যামাটক্সিন** (amatoxins) নামক পদার্থ থাকে।

ছত্রাকের বৈশিষ্ট্য

১। ছত্রাক ক্লোরোফিলবিহীন, অসবুজ, সালোকসংশ্লেষণে অক্ষম, অপুষ্পক উদ্ভিদ।
২। এরা **মৃতজীবী** (saprophytic), **পরজীবী** (parasitic) বা **মিথোজীবী** (symbiotic) হিসেবে বাস করে।
৩। এরা **সুকেন্দ্রিক** অর্থাৎ এদের কোষে সুগঠিত নিউক্লিয়াস ও বিভিন্ন অঙ্গাণু বিদ্যমান।
৪। ছত্রাকের কোষপ্রাচীর **কাইটিন** (এক প্রকার জটিল পলিস্যাকারাইড) নির্মিত। [MAT 20-21]
৫। ছত্রাকের সঞ্চিত খাদ্য প্রধানত **গ্লাইকোজেন** (glycogen), **তৈলবিন্দু**, কখনো কখনো কিছু পরিমাণ ভলিউটিন ও চর্বি থাকতে পারে। [MAT 12-13]
৬। ছত্রাকদেহে ভাস্কুলার টিস্যু নেই।
৭। ছত্রাকের জননাঙ্গ এককোষী (unicellular)।
৮। স্ত্রী জননাঙ্গে থাকা অবস্থায় জাইগোট বহুকোষী ভ্রূণে পরিণত হয় না।
৯। **হ্যাপ্লয়েড স্পোর** দিয়ে বংশবিস্তার হয়।
১০। জাইগোট-এ মায়োসিস বিভাজন ঘটে, তাই থ্যালাস হ্যাপ্লয়েড (n)।
১১। অধিকাংশ ছত্রাক সদস্যই **শোষণ প্রক্রিয়ার** মাধ্যমে পুষ্টি সংগ্রহ করে।
১২। এদের রয়েছে তীব্র **অভিযোজন ক্ষমতা** (কতক 5°C নিম্নতাপমাত্রায় এবং কতক 50°C এর ওপর তাপমাত্রায় জন্মাতে পারে)।
১৩। ছত্রাক থ্যালোফাইটা জাতীয় উদ্ভিদ।
১৪। এককোষী ছাড়া প্রায় সব ছত্রাকের দেহ **হাইফি** দ্বারা গঠিত।

মার্গুলিস কিংডম ফানজাইকে পাঁচটি ফাইলামে বিভক্ত করেছেন। ফাইলাম পাঁচটি হলো : ১। Zygomycota, ২। Ascomycota, ৩। Basidiomycota, ৪। Deuteromycota এবং ৫। Mycophycophyta.

ছত্রাকের দৈহিক গঠন (Vegetative structure of fungi) : অধিকাংশ ছত্রাকই বহুকোষী। এদের দেহ সূত্রাকার (filamentous), শাখান্বিত এবং আণুবীক্ষণিক। ছত্রাকের সূত্রাকার শাখাকে একবচনে **হাইফা** (hypha) এবং বহুবচনে **হাইফি** (hyphae) বলা হয়। এক একটি হাইফা সরু, স্বচ্ছ ও নলাকার। কোনো কোনো ছত্রাকে হাইফা প্রস্থপ্রাচীরবিশিষ্ট। হাইফার

প্রস্থপ্রাচীরকে **সেপ্টা** (septa) বলে। সেপ্টাতে ছিদ্র থাকে। কোনো কোনো ছত্রাকে হাইফা প্রস্থপ্রাচীরবিহীন হয়। অসংখ্য শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট সূত্রাকার হাইফি দ্বারা গঠিত ছত্রাক দেহকে **মাইসেলিয়াম** (mycelium) বলে। মাইসেলিয়ামে অবস্থিত অনেকগুলো হাইফি যখন প্রস্থপ্রাচীরবিহীন এবং বহু নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট হয় তখন তাকে **সিনোসাইটিক মাইসেলিয়াম** বলে; যেমন-*Saprolegnia* sp-এ দেখা যায়। কোষে বা হাইফাতে এক বা একাধিক নিউক্লিয়াস থাকতে পারে। কোষে একাধিক নিউক্লিয়াস থাকলে তাকে **সিনোসাইট** বলে। পরজীবী ছত্রাক পোষক দেহের ভেতরে বিশেষ ধরনের হাইফা প্রবেশ করিয়ে সেখান থেকে খাদ্য শোষণ করে নেয়। পোষক দেহ থেকে খাদ্য শোষণকারী হাইফাকে **হস্টোরিয়াম** বলে; যেমন–*Phytophthora*-তে দেখা যায়। পরিবেশ থেকে খাদ্য শোষণকারী হাইফাকে **রাইজয়েড বলে**। কোনো কোনো উচ্চশ্রেণির ছত্রাকে মাইসেলিয়াম শক্ত রশির মতো গঠন সৃষ্টি করে যাকে **রাইজোমর্ফ** (rhizomorph) বলে; যেমন-*Agaricus*-এ থাকে। উদ্ভিদের সরু মূল বা মূলরোমের চারদিকে বা অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট ছত্রাক জালের মতো বেষ্টন করে রাখে। এদেরকে **মাইকোরাইজাল ছত্রাক** বলে; যেমন— *Saprolegnia* sp। উদ্ভিদ মূল ও ছত্রাকের মধ্যকার এমন মিথোজীবী আচরণ বা এসোসিয়েশনকে বলা হয় **মাইকোরাইজা** (Mycorrhiza, pl. Mycorrhizae), যেমন–*Amanita*। উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদের জন্য এ মাইকোরাইজাল এসোসিয়েশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ভিদের জন্য এরা খনিজ লবণ, বিশেষ করে ফসফরাস সরবরাহ করে এবং মূল থেকে খাদ্য শোষণ করে। এদের অবস্থান **মিথোজীবী**। এর ওপর ভিত্তি করেই স্থলজ উদ্ভিদের উদ্ভব ঘটেছে।

সঞ্চিত খাদ্য (Reserve Food) : ছত্রাক কোষে গ্লাইকোজেন ও তৈলবিন্দুরূপে খাদ্য সঞ্চিত থাকে।

ছত্রাকের কোষীয় গঠন (Cell Structure) : কিছু নিম্নশ্রেণির ছত্রাক ছাড়া অধিকাংশ ছত্রাকের কোষ দুটি অংশে বিভক্ত—**কোষ প্রাচীর ও প্রোটোপ্লাস্ট**।

১। কোষ প্রাচীর : বিভিন্ন শ্রেণির ছত্রাকের কোষ প্রাচীরে পার্থক্য থাকলেও অধিকাংশ ছত্রাক কোষের কোষ প্রাচীরের মুখ্য উপাদান **কাইটিন** জাতীয় পদার্থ। কাইটিন হলো এক প্রকার জটিল পলিস্যাকারাইড। প্রোটোপ্লাস্টকে সংরক্ষণ করাই এর প্রধান কাজ। এটি পানি ও অন্যান্য দ্রবণের জন্য ভেদ্য।

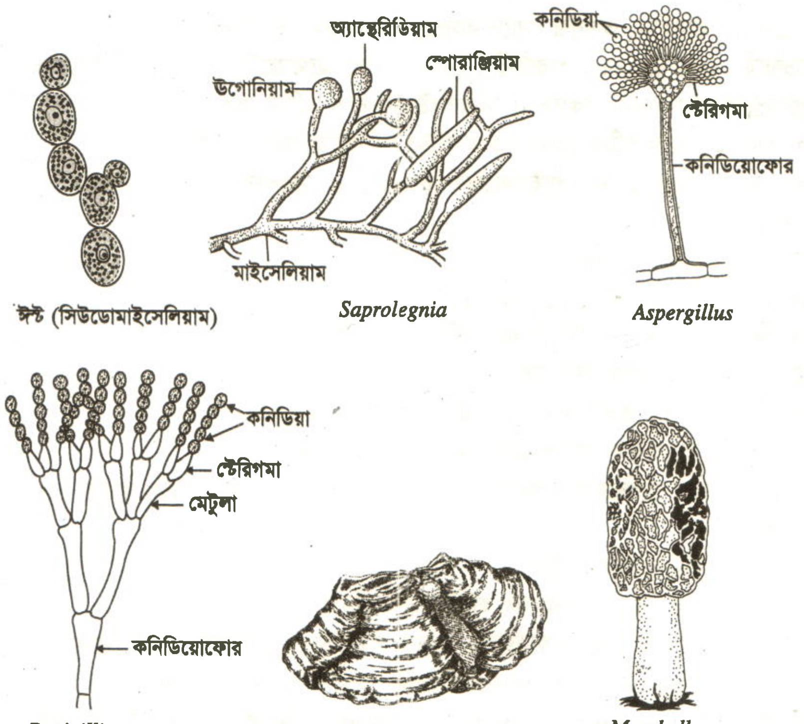

চিত্র ৫.৬ : কয়েকটি ছত্রাক। এর মধ্যে ঈস্ট আণুবীক্ষণিক, *Polyporus* ও *Morchella* খালি চোখে ভালো দেখা যায়; অন্য তিনটি সেমি আণুবীক্ষণিক।

২। **প্রোটোপ্লাস্ট :** কোষপ্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত সমুদয় জীবিত পদার্থই **প্রোটোপ্লাস্ট** নামে পরিচিত। কোষঝিল্লি, সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস নিয়ে ছত্রাকের প্রোটোপ্লাস্ট গঠিত হয়ে থাকে। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

(ক) কোষঝিল্লি : কোষপ্রাচীরের ভেতরের দিকে অবস্থিত এটি একটি পাতলা পর্দা যা কোষপ্রাচীরের সাথে নিবিড়ভাবে লেগে থাকে। **ছত্রাকের কোষঝিল্লির প্রধান উপাদান ergosterol।** কোষঝিল্লিটি কোনো কোনো স্থানে ক্ষুদ্র পকেটের আকারে ভাঁজ হয়ে **লোমাজোম** গঠন করে থাকে। [MAT 19-20]

(খ) সাইটোপ্লাজম : কোষঝিল্লির ভেতরের দিকে জেলির ন্যায় পদার্থটির নাম সাইটোপ্লাজম। তরুণ মাইসেলিয়াম ও হাইফার শীর্ষদেশে সাইটোপ্লাজম ঘন দানাদার ও সমস্বত্ব। কিন্তু পরিণত মাইসেলিয়ামে সাইটোপ্লাজম অপেক্ষাকৃত পাতলা ও গহ্বরযুক্ত থাকে। সাইটোপ্লাজমের ভেতরে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, মাইটোকন্ড্রিয়া, কোষগহ্বর প্রভৃতি থাকে, তবে প্লাস্টিড থাকে না। সাইটোপ্লাজমে **সঞ্চিত খাদ্য** হিসেবে **গ্লাইকোজেন, ভলিউটিন, তৈলবিন্দু, চর্বি** প্রভৃতি বিদ্যমান। কতিপয় প্রজাতির ছত্রাকের সাইটোপ্লাজমে বিশেষ করে স্পোরে লাল, নীল বা বেগুনি বর্ণের ক্যারোটিনয়েড পদার্থ থাকে।

(গ) নিউক্লিয়াস : ছত্রাকের সাইটোপ্লাজমে এক বা একাধিক গোলাকার বা উপবৃত্তাকার নিউক্লিয়াস থাকে। প্রতিটি নিউক্লিয়াসে একটি নির্দিষ্ট ও সচ্ছিদ্র **নিউক্লিয়ার মেমব্রেন** থাকে। নিউক্লিয়াসের কেন্দ্রীয় অঞ্চলটি অপেক্ষাকৃত ঘন থাকে। কোনো কোনো ছত্রাকবিদ এ কেন্দ্রীয় অঞ্চলটিকে **নিউক্লিওলাস** হিসাবে গণ্য করে থাকেন।

ছত্রাকের ডাইমর্ফিজম (Dimorphism) : ভিন্নতর পরিবেশের কারণে নিজের আকৃতি পরিবর্তনের যোগ্যতাকে **ডাইমর্ফিজম** বলে। *Histoplasma capsulatum* মাটিতে সূত্রাকার এবং মানুষের ফুসফুসে কোষপিণ্ড হিসেবে অবস্থান করে। এটি **হিস্টোপ্লাজমোসিস** রোগ সৃষ্টি করে।

ছত্রাকের খাদ্যগ্রহণ : ছত্রাক **শোষণ** (absorption) প্রক্রিয়ায় খাদ্য গ্রহণ করে। হাইফি তার চারপাশে খাদ্যদ্রব্যে পরিপাকীয় এনজাইম নিঃসরণ করে খাদ্য পরিপাক করে। এ পরিপাককৃত খাদ্য হাইফির অভ্যন্তরে ব্যাপ্ত হয় অথবা সক্রিয়ভাবে কোষাভ্যন্তরে স্থানান্তরিত হয়। এ কার্যটি সাধারণত হাইফির শীর্ষের দিকেই হয়ে থাকে। খাদ্যদ্রব্য পরে সাইটোপ্লাজমিক প্রবাহের (cytoplasmic streaming) মাধ্যমে দেহের পুরাতন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। পরজীবী ছত্রাক পোষক কোষের অভ্যন্তর থেকে **হস্টোরিয়া** (haustoria)-এর মাধ্যমে খাদ্য শোষণ করে। শর্করা, ফ্যাটি অ্যাসিড, অ্যামিনো অ্যাসিড, খনিজ লবণ ও ভিটামিন ছত্রাকের প্রধান খাদ্য।

ছত্রাকের বৃদ্ধি : বৃদ্ধিকালে অধিকাংশ বিপাকীয় কার্যাবলি হাইফির শীর্ষে ঘটে থাকে। অধিকাংশ নিউক্লিয়াস, মাইটোকন্ড্রিয়া, অন্যান্য অঙ্গাণু বর্ধিষ্ণু শীর্ষের পেছনেই জড় হয়। হাইফির মাথাকে **ডোম** (dome) বলা হয়। ডোম অঞ্চলে নতুন সৃষ্ট ভেসিকল (vesicle) জড় হয় যা কোষঝিল্লি ও কোষ প্রাচীর তৈরির উপাদান ও এনজাইম বহন করে থাকে।

ছত্রাকের জনন (Reproduction of fungi) : ছত্রাক প্রজাতি সাধারণত অঙ্গজ, অযৌন ও যৌন উপায়ে জননকার্য সম্পন্ন করে থাকে। কোনো কোনো ছত্রাক প্রজাতির সমস্ত দেহকোষটিই জনন কাজে ব্যবহৃত হয়; ফলে এ ধরনের ছত্রাকের দৈহিক ও জনন অঙ্গের কোনো পার্থক্য থাকে না। এরূপ ছত্রাককে বলা হয় **হলোকারপিক** ছত্রাক; যেমন- *Synchytrium*.। আবার অধিকাংশ ছত্রাকের দেহের অংশবিশেষ হতে জননযন্ত্রের সৃষ্টি হয়; অন্য অংশ স্বাভাবিক থাকে। এরূপ ছত্রাককে বলা হয় **ইউকারপিক** ছত্রাক; যেমন- *Saprolegnia*। নিম্নে বিভিন্ন জনন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১। অঙ্গজ জনন (Vegetative Reproduction) : দেহাঙ্গের মাধ্যমে অঙ্গজ জনন হয়। নিম্নলিখিত উপায়ে ছত্রাকের অঙ্গজ জনন হয়ে থাকে।

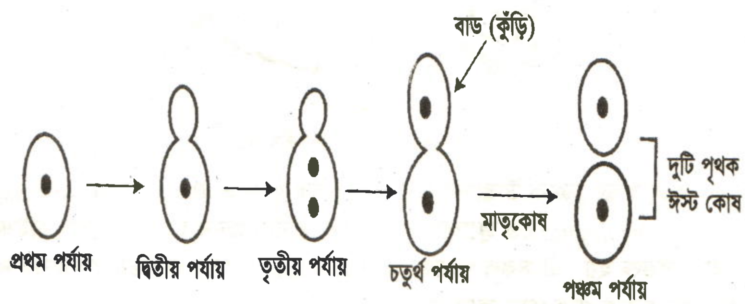

চিত্র ৫.৭ : ঈস্টের বাডিং অর্থাৎ কুঁড়ি সৃষ্টির মাধ্যমে অঙ্গজ জনন।

(i) দৈহিক খণ্ডায়ন (Fragmentation) : ছত্রাক দেহটি একাধিক খণ্ডে বিভক্ত হয় এবং প্রতিটি খণ্ড একটি স্বতন্ত্র ছত্রাক দেহে পরিণত হয়, যেমন– *Rhizopus, Penicillium*।

(ii) দ্বি-ভাজন (Binary fission) : দৈহিক কোষটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় দু'টি অপত্যকোষের সৃষ্টি করে এবং প্রতিটি অপত্যকোষ একটি স্বতন্ত্র ছত্রাক কোষে পরিণত হয়। ঈস্ট বা *Saccharomyces* ছত্রাকে এরূপ দেখা যায়।

(iii) কুঁড়ি সৃষ্টি (Budding) : কোনো কোনো ছত্রাকের দেহ থেকে কুঁড়ি সৃষ্টি হয় এবং কুঁড়িটি পৃথক হয়ে একটি স্বতন্ত্র ছত্রাকের সৃষ্টি করে। ঈস্ট বা *Saccharomyces* ছত্রাকে এরূপ দেখা যায়।

২। অযৌন জনন (Asexual Reproduction) : ছত্রাকের **অযৌন জননের প্রধান প্রক্রিয়া হলো স্পোর উৎপাদন প্রক্রিয়া**। অযৌন স্পোর প্রধানত দু'প্রকার; যথা– স্পোরাঞ্জিওস্পোর ও কনিডিয়া। ছত্রাকের স্পোর উৎপাদন অঙ্গকে **স্পোরাঞ্জিয়াম** (বহুবচনে স্পোরাঞ্জিয়া) বলে। স্পোরাঞ্জিয়ামের অভ্যন্তরে স্পোর উৎপন্ন হলে তাকে **স্পোরাঞ্জিওস্পোর** বলে। স্পোরাঞ্জিওস্পোর দু'ধরনের– (i) জুস্পোর ও (ii) অ্যাপ্ল্যানোস্পোর। স্পোরাঞ্জিওস্পোরের সাথে ফ্ল্যাজেলা যুক্ত থাকলে তাকে **জুস্পোর** বলে; যেমন– *Saprolegnia*। স্পোরাঞ্জিওস্পোর যদি ফ্ল্যাজেলাবিহীন হয় তবে তাকে **অ্যাপ্ল্যানোস্পোর** বলে। প্রজাতির ওপর নির্ভর করে প্রতিটি স্পোরাঞ্জিয়ামে অ্যাপ্ল্যানোস্পোরের সংখ্যা ১ থেকে একাধিক হতে পারে; যেমন– *Mucor*। কনিডিওফোর নামক বিশেষ হাইফার মাথায়ও স্পোর উৎপন্ন হতে পারে, এরূপ স্পোরকে **কনিডিয়া** বলা হয়। স্পোর পুরু আবরণ দিয়ে আবৃত থাকলে তাকে **ক্ল্যামাইডোস্পোর** বলে; যেমন– *Mucor, Fusarium*। স্পোরগুলো

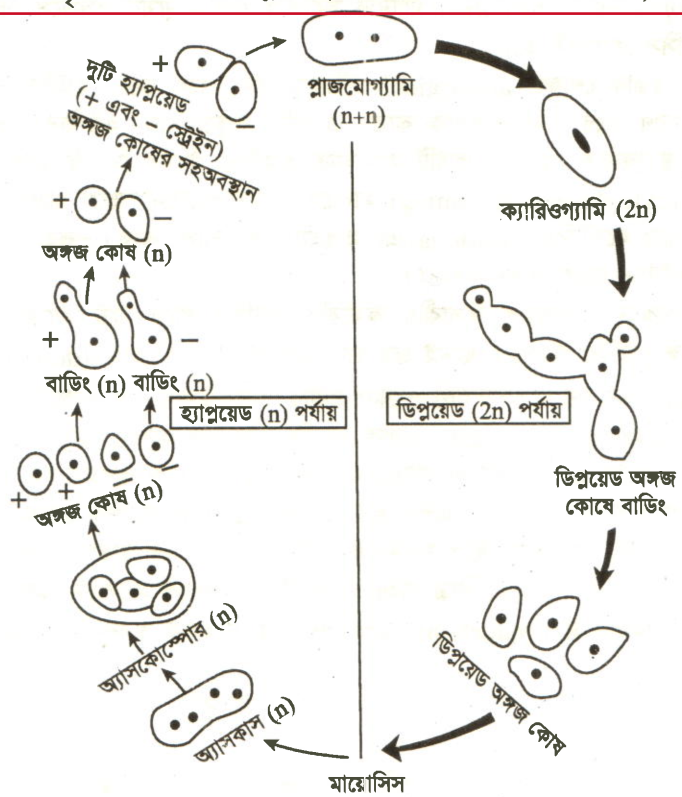

চিত্র ৫.৮ : ছত্রাকের জীবনচক্র।

উপযুক্ত পরিবেশে অঙ্কুরিত হয়ে স্বতন্ত্র ছত্রাক উদ্ভিদের জন্ম দেয় (চিত্র ৫.৬ এ *Penicillium* এবং *Aspergillus* এ কনিডিয়া উৎপাদন দেখানো হয়েছে)। *Saprolegnia*-তে জুস্পোরের মাধ্যমে অযৌন জনন হয়। ছত্রাকের হাইফাগুলো প্রস্থপ্রাচীর সৃষ্টির মাধ্যমে ছোটো ছোটো খণ্ডে বিভক্ত হয়। ঐ সকল খণ্ডকে **অয়ডিয়া** (oidia) বলে। অয়ডিয়া স্পোরের ন্যায় আবরণ তৈরি করে অংকুরোদগমের মাধ্যমে নতুন ছত্রাক দেহ গঠন করে; যেমন *Coprinus togopus*।

৩। **যৌন জনন (Sexual Reproduction) :** দু'টি গ্যামিটের মিলনের মাধ্যমে যৌন জনন ঘটে থাকে। ছত্রাকের জননাঙ্গকে **গ্যামিট্যাঞ্জিয়াম** (বহুবচনে- গ্যামিট্যাঞ্জিয়া) বলা হয়। গ্যামিট্যাঞ্জিয়ামে গ্যামিট সৃষ্টি হয়। পুং এবং স্ত্রী (বা +,-) গ্যামিট একই রকম (কোনো পার্থক্য বোঝা যায় না) হলে তাকে **আইসোগ্যামিট** বলে। পুং এবং স্ত্রী গ্যামিট পৃথক যোগ্য হলে সাধারণত পুং গ্যামিট্যাঞ্জিয়ামকে **অ্যানথেরিডিয়াম** এবং স্ত্রী গ্যামিট্যাঞ্জিয়ামকে **উগোনিয়াম** বলা হয়। একই রকম জনন কোষের মিলনকে **আইসোগ্যামি** এবং দু' ধরনের জনন কোষের মিলনকে **হেটারোগ্যামি** বা **উগ্যামি** বলে। প্রাথমিকভাবে দু'টি জনন কোষের প্রোটোপ্লাজমের মিলন ঘটে যাকে বলা হয় **প্লাজমোগ্যামি** (plasmogamy) এবং পরে নিউক্লিয়াস দু'টির মিলন ঘটে যাকে বলা হয় **ক্যারিওগ্যামি**। ক্যারিওগ্যামির মাধ্যমে জাইগোট সৃষ্টি হয়। গ্যামিট সৃষ্টি, প্লাজমোগ্যামি ও ক্যারিওগ্যামি এ তিনটি পর্যায় শেষে ছত্রাকের যৌন জনন সম্পন্ন হয়। জাইগোটের মায়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে ছত্রাকটি পুনরায় হ্যাপ্লয়েড (n) অবস্থাপ্রাপ্ত হয়। (চিত্র ৫.৬ এ *Saprolegnia*-তে উগোনিয়াম ও অ্যান্থেরিডিয়াম দেখানো হয়েছে।)

অ্যাসকোমাইকোটা বা স্যাক ফানজাই-তে অ্যাসকাস নামক নলের ভেতরে ৪–৮টি **অ্যাসকোস্পোর** তৈরি হয়। ব্যাসিডিওমাইকোটা বা ক্লাব ফানজাই-তে ব্যাসিডিওকার্প-এ সৃষ্ট ব্যাসিডিয়ামের মাথায় **ব্যাসিডিওস্পোর** উৎপন্ন হয়। কতক ছত্রাকের যৌন জনন প্রক্রিয়ায় দুটি mating type-এর (+ এবং -) সাইটোপ্লাজম প্রথম একসাথে মিশে যায় কিন্তু নিউক্লিয়াস দুটি বহু পরে মিলিত হয়। কাজেই নিউক্লিয়াস দুটি মিলিত হওয়ার (ক্যারিওগ্যামি) পূর্ব পর্যন্ত এ হাইফার ভেতরে বংশগতীয়ভাবে দু' প্রকার দুটি হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস বিরাজ করে। বংশগতীয়ভাবে দু' প্রকার দুটি হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট কোষ বা হাইফাকে **dikaryotic** কোষ বা **dikaryotic** হাইফা বলা হয়। পুরো মাইসেলিয়াম এরূপ হলে তাকে dikaryotic মাইসেলিয়াম বলা হয়। দুটি নিউক্লিয়াস থাকে বলে এটি **ডাইক্যারিয়ন** (dikaryon), আবার দু' প্রকার (+, -) নিউক্লিয়াস থাকে বলে এটি **হেটারোক্যারিয়ন**।

ছত্রাকের গুরুত্ব (Importance of Fungi) : ছত্রাকের গুরুত্ব অপরিসীম। ছত্রাক আমাদের জীবন ও কার্যাবলির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকলেও এদের উপকারিতার বিষয়ে আমরা যেমন অনুভব করি না, তেমনি অপকারিতার বিষয় সম্পর্কেও আমরা সচেতন নই।

ছত্রাকের উপকারী প্রভাব (Beneficial Effect)

১। **খাদ্য হিসেবে ছত্রাক :** মাশরুম (mushrooms–*Agaricus, Volvariella*), মোরেল (morels–*Morchella*), ট্রাফল (truffles-Tuber) প্রভৃতি নামে পরিচিত বিভিন্ন প্রজাতির ছত্রাক বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে চাষ করা হয়। *Agaricus bisporus* এবং *A. campestris* প্রজাতির মাশরুম সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এগুলোর পুষ্টিগুণও উচ্চমানের।

[MAT 22-23]

২। **ওষুধ তৈরিতে :** পৃথিবীর প্রথম বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত অ্যান্টিবায়োটিক পেনিসিলিন, *Penicillium chrysogenum* নামক ছত্রাক থেকে তৈরি হয়। *Claviceps purpurea* ছত্রাক থেকে **ergot** তৈরি হয় যা ওষুধ হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়, বিশেষ করে সন্তান প্রসবের পর রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে। মৃত্তিকাবাসী ছত্রাক থেকে (*Tolypocladium inflatum*) **সাইক্লোস্পোরিন** (cyclosporine) ওষুধ তৈরি হয় যা মানুষের যেকোনো অঙ্গ ট্রান্সপ্লান্ট করতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। *Aspergillus* ছত্রাক থেকে **স্টেরয়েড** পাওয়া যায়, এটি **আর্থ্রাইটিস** নিরাময় করে। আমাদের নিজস্ব গবেষণায় মাশরুমের ডায়াবেটিস কমানোর দারুণ ক্ষমতা প্রমাণিত হয়েছে। **মেজিক মাশরুমে** থাকে সিলোসাইবিন এবং সিলোসিন। এরা হ্যালুসিনোজেন-এর মূল উপাদান। বিষণ্ণতা দূর করতে হ্যালুসিনোজেনিক ওষুধ দেয়া হয়।

৩। **জৈব অ্যাসিড ও উৎসেচক তৈরিতে :** বিভিন্ন প্রজাতির ছত্রাক থেকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত বিভিন্ন জৈব অ্যাসিড ও উৎসেচক তৈরি করা হয়। যেমন-*Saccharomyces cerevisiae* ছত্রাক থেকে **ইনভারটেজ** নামক উৎসেচক পাওয়া যায়। **ডায়াস্টেজ** ও জৈব অ্যাসিড তৈরি করতে *Aspergillus* ছত্রাক ব্যবহার করা হয়।

৪। **পরিবেশ সংরক্ষণে :** ছত্রাক পরিবেশ থেকে বিষাক্ত দূষক পদার্থ বিশ্লিষ্ট (decompose) করে পরিবেশকে বিষাক্ত পদার্থ থেকে দূষণমুক্ত করে। এ প্রক্রিয়াকে **বায়োরিমেডিয়েশন** (bioremediation) বলে। বর্জ্য পদার্থ বিশ্লিষ্ট করে ছত্রাক পরিবেশে কার্বন ও অন্যান্য মৌল ফিরিয়ে দেয় যা পরবর্তীতে উদ্ভিদ পুনরায় ব্যবহার করতে পারে।

৫। **হরমোন :** *Gibberella fujikuroi* নামক ছত্রাক থেকে উদ্ভিদের বৃদ্ধি হরমোন **জিবেরেলিন** পাওয়া যায়।

৬। কৃষিতে ব্যবহার : ছত্রাকের বহুমুখী ব্যবহার কৃষিতে লক্ষ্য করা যায়। মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতেও ছত্রাকের অবদান আছে। এক একর উর্বর জমির ওপরের ৮ ইঞ্চি মাটিতে এক টন পরিমাণ ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে। মৃত জীবদেহ ও জৈব বর্জ্য পচনের মাধ্যমে জৈব সার তৈরিতে ছত্রাকের যথেষ্ট ভূমিকা আছে।

৭। মৌলিক গবেষণায় : আণবিক জীববিজ্ঞানের উচ্চতর গবেষণার কাজে *Saccharomyces cerevisiae* এর AH 109, PJ 69-4 alpha, Y187 ইত্যাদি জাত ব্যবহার করা হয়।

৮। শিল্পদ্রব্য উৎপাদনে : অত্যাবশ্যকীয় শিল্পদ্রব্য উৎপাদনে বিভিন্ন প্রকার ছত্রাক বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

(i) *Saccharomyces* নামক ঈস্টের বিভিন্ন প্রজাতি ভিটামিন B ও C, গ্লিসারিন তৈরিতে, কোকোর বীজ থেকে চকোলেট সংগ্রহ করে সুগন্ধযুক্ত করাতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

(ii) বেকারিতে পাউরুটি ও কেক তৈরিতে *Saccharomyces* ঈস্ট ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। *Penicillium camemberti* ও *P. rosqueferti* ব্যবহার করে সুরভিত পনির প্রস্তুত করা হয়।

(iii) মদ তৈরিতে *Saccharomyces cerevisiae* ছত্রাক প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এজন্য একে brewer yeast বলে।

(iv) খেজুর, তাল, আঙ্গুর ও আখের রস থেকে *Saccharomyces* ঈস্টের মাধ্যমে গাঁজন প্রক্রিয়ায় অ্যালকোহল প্রস্তুত করা হয়।

(v) *Penicillium* এর বিভিন্ন প্রজাতি ব্যবহার করে বিভিন্ন জৈব অ্যাসিড; যেমন-সাইট্রিক অ্যাসিড, ফিউমারিক অ্যাসিড, অক্সালিক অ্যাসিড, ম্যালিক অ্যাসিড ইত্যাদি উৎপাদন করা হয়।

ছত্রাকের অপকারী বা ক্ষতিকর প্রভাব (Harmful Effect)

১। খাদ্যদ্রব্য পচন ও বিষক্রিয়া সৃষ্টি : কিছুসংখ্যক মৃতজীবী ছত্রাক আমাদের খাদ্যদ্রব্যে পচন ও বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। যেমন-*Aspergillus, Penicillium* প্রভৃতি ছত্রাক আচার, চাটনি, জ্যাম ও জেলি নষ্ট করে দেয় এবং ছত্রাকের আক্রমণে গুদামজাত শস্য নষ্ট হয়। *Aspergillus flavus* মাইকোটক্সিন সৃষ্টি করে।

২। উদ্ভিদের রোগ সৃষ্টি : পরজীবী ছত্রাক আবাদি ফসলের মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে। ব্লাইট, ব্লাস্ট, মিলডিউ, রট প্রভৃতি উদ্ভিদ রোগের কারণ বিভিন্ন প্রজাতির পরজীবী ছত্রাক। ১৯৪২ সালে তৎকালীন বাংলায় মহাদুর্ভিক্ষ হয়েছিল ধানের ছত্রাকজনিত বাদামি দাগ রোগের কারণে। এ রোগ *Helminthosprium oryzae* নামক ছত্রাক দিয়ে সৃষ্টি হয়। আলুর বিলম্বিত ধ্বসা (লেট ব্লাইট) রোগের কারণে **১৮৪৩–১৮৪৭ সাল পর্যন্ত আয়ারল্যান্ডে আলু ক্ষেতের ফলন প্রায় সম্পূর্ণটাই নষ্ট হয়ে যায়,** যার ফলে আয়ারল্যান্ডে মহাদুর্ভিক্ষ দেখা দেয় ও দশ লক্ষ লোক মারা যায়। *Phytophthora infestans* নামক ছত্রাকের আক্রমণে আলুর বিলম্বিত ধ্বসা রোগ হয়। *Puccinia graminis-tritici* নামক ছত্রাক দ্বারা গম গাছে মরিচা রোগ হয়।

পিটার দ্যা গ্রেট ১৭২২ খ্রিষ্টাব্দে তুরস্ক দখল করতে যায়। আরগোট আক্রান্ত রাই খেয়ে পরদিন সকালে তার শতাধিক ঘোড়া পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং বহুলোক মারা যায়। পরিণামে অভিযান বন্ধ ঘোষিত হয়।

৩। প্রাণীর রোগ সৃষ্টিতে : *Aspergillus, Mucor, Rhizopus, Cercospora* প্রভৃতি ছত্রাক মানুষ ও অন্যান্য প্রাণিদেহে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে। *Microsporium* ছত্রাকের আক্রমণে মানুষের মাথায় চুল পড়ে গিয়ে টাকের সৃষ্টি হয়।

৪। কাগজ বিনষ্টকরণে : *Penicillium, Alternaria* ও *Fusarium* জাতীয় ছত্রাক কাগজের ওপর জন্মিয়ে কাগজ বিনষ্ট করে ফেলে।

৫। কাঠের পচন ও ক্ষয় : বহু ছত্রাক (*Poria, Serpula, Polyporus*) আছে যারা কাঠের পচন সৃষ্টি করে মূল্যবান সম্পদ বিনষ্ট করে।

৬। চামড়া ও কাপড়ে চিতি : বর্ষাকালে চামড়া ও কাগজের ওপর *Aspergillus* ছত্রাক জন্মায় এবং চামড়া ও কাপড়ের ওপর চিতি তৈরি করায় চামড়া ও কাপড় নষ্ট হয়ে যায়।

৭। গৃহপালিত পশু-পাখি ও মাছের রোগ : *Aspergillus funigatus* ছত্রাক হাঁস-মুরগি ও পাখির গর্ভপাত ঘটায়। *Microsporium canis* নামক ছত্রাক কুকুর ও ঘোড়ার শরীরে দাদজাতীয় চর্মরোগ সৃষ্টি করে। *Saprolegnia parasitica* ছত্রাক দ্বারা মাছের স্যামন রোগ সৃষ্টি হয়।

৮। মানুষের রোগ সৃষ্টি : *Trichophyton rubrum* নামক ছত্রাকের আক্রমণে মানুষের দেহে দাদরোগ সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন ছত্রাকঘটিত রোগগুলোকে একত্রে **মাইকোসিস** (Mycoses) এবং **অ্যাস্পারজিলোসিস** (Aspergelloses) বলা হয়। *Mucor* ও *Rhizopus* গণের কোনো কোনো প্রজাতি মস্তিষ্ক, ফুসফুস ও খাদ্য নালিতে **জাইগোমাইকোসিস** নামক রোগ সৃষ্টি করে। *Trichoderma* ও *Candida* গণের কোনো কোনো প্রজাতি পুরুষাঙ্গের রোগ সৃষ্টি করে। যক্ষ্মার মতো ফুসফুসের coccidiomycosis নামক রোগ হয় এক প্রকার **স্যাক ফাংগাস** দিয়ে। *Absidia corymbifera* নামক ছত্রাক মানুষের দেহে **ব্রঙ্কোমাইকোসিস** নামক রোগ সৃষ্টি করে। *Candida albicans* নামক ছত্রাক মুখ, নাক, গলা ইত্যাদি স্থানের মিউকাস ঝিল্লির

ক্ষতিসাধন করে। এ রোগকে **candidiasis** বলে। ঐসব স্থানে অবস্থানরত ব্যাকটেরিয়া *Candida*-র আক্রমণ প্রতিহত করে রাখে। অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণের কারণে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে *Candida*-র আক্রমণ মারাত্মক হয়। হলুদ ছত্রাক *Mucor septicus* নাক, মুখ, ফুসফুস ও মস্তিষ্কে সংক্রমণ ঘটায়। এর স্পোর অক্সিজেন নলের মাধ্যমেও ফুসফুসে প্রবেশ করতে পারে। ২০২১ সালে ভারতে কভিড-১৯ আক্রমণের পরপর এ ছত্রাক আক্রমণের বিস্তার ঘটেছিল।

৯। মাছের রোগ সৃষ্টি : *Saprolegnia* ছত্রাক কার্পজাতীয় মাছের বিশেষ রোগ সৃষ্টি করে উৎপাদন হ্রাস করে।

(i) জড় কোষপ্রাচীর, (ii) নিশ্চলতা, (iii) খাদ্যগ্রহণ ও (iv) স্পোর উৎপাদন সংক্রান্ত মিলের কারণে ছত্রাক এক সময় উদ্ভিদরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখন ছত্রাক পৃথক রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

কারণ—

(i) মাইটোসিস-এর সময় নিউক্লিয়ার এনভেলপ বিলুপ্ত হয় না।
(ii) মাইটোটিক স্পিন্ডল নিউক্লিয়াসের ভেতরে হয়।
(iii) ক্রোমোসোমে খুব অল্প পরিমাণে হিস্টোন প্রোটিন থাকে।
(iv) কোনো সেন্ট্রিওল থাকে না।
(v) কোষপ্রাচীর কাইটিন নির্মিত, সেলুলোজ নির্মিত নয়।

ছত্রাক প্রাণিজগতের সাথে অধিক মিলসম্পন্ন, যেমন—

১। দেহ ক্লোরোফিলবিহীন।
২। এরা মৃতভোজী বা পরভোজী অর্থাৎ পরনির্ভর।
৩। সঞ্চিত খাদ্য গ্লাইকোজেন।
৪। কোষঝিল্লি ergosterol সমৃদ্ধ।
৫। কোষ প্রাচীর কাইটিন দিয়ে গঠিত যা পতঙ্গ গ্রুপের বহিঃকঙ্কালের সাথে মিলসম্পন্ন।

অধিকৃত জায়গা (আয়তন) হিসেবে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো প্রজাতি *Armillaria ostoyae* যা যুক্তরাষ্ট্রের অরিগন বনে আছে। এর দখলকৃত জায়গার পরিমাণ **১৬৬৫টি** ফুটবল খেলার মাঠের চেয়েও বেশি।

Genus : *Agaricus* (এগারিকাস)

শ্রেণিবিন্যাস

Kingdom : Fungi
Division : Basidiomycota
Class : Basidiomycetes
Order : Agaricales
Family : Agaricaceae
Genus : *Agaricus*

বাংলাদেশ থেকে নথিভুক্ত প্রজাতি হলো *A. bisporus* (Leg.) Sing. এটি হোয়াইট বাটন মাশরুম নামে পরিচিত।

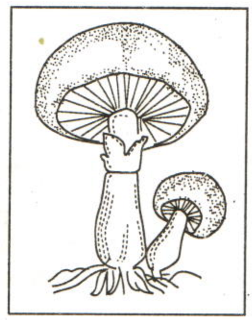

বর্ষাকালে বাড়ির আশপাশ বা মাঠে ময়দানে পাশের চিত্রটির ন্যায় কোনো বস্তু কখনো দেখেছো কি? সাধারণ মানুষের কাছে এগুলো **'ব্যাঙের ছাতা'** নামে পরিচিত। আসলে এটি এক ধরনের ছত্রাক, যার সাধারণ নাম **মাশরুম**, আর বৈজ্ঞানিক নাম *Agaricus*। এখানে *Agaricus* ছত্রাক সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো :

আবাসস্থল : *Agaricus* ভেজা মাটিতে, মাঠে-ময়দানে বা গোবর, খড় ইত্যাদি পচনশীল জৈব পদার্থের ওপর জন্মায়। এরা মৃতজীবী (saprophytic)। সাধারণত এদের বায়বীয় অংশ খাড়া হয়ে ওপরে বৃদ্ধি পায় এবং পরিণত অবস্থায় অনেকটা ছাতার মতো দেখায়। তাই এদেরকে **'ব্যাঙের ছাতা'** বলা হয়। মাইসেলিয়াম থেকে ছাতার ন্যায় বায়বীয় অংশ সৃষ্টিকে **ফ্রুকটিফিকেশন** (fructification) বলা হয় এবং ঐ বায়বীয় অংশকে *Agaricus* উদ্ভিদের **ফ্রুটবডি** (fruit body বা fruiting body) বলা হয়। এরা **'মাশরুম'** (mushroom) নামেও পরিচিত। অনেক সময় **লনে** (Lawn-খালি জায়গা) অনেকগুলো মাশরুম বৃত্তাকারে বা চক্রাকারে অবস্থান করতে দেখা যায়। এরূপ অবস্থাকে **পরীচক্র** (fairy ring) বলা হয়।

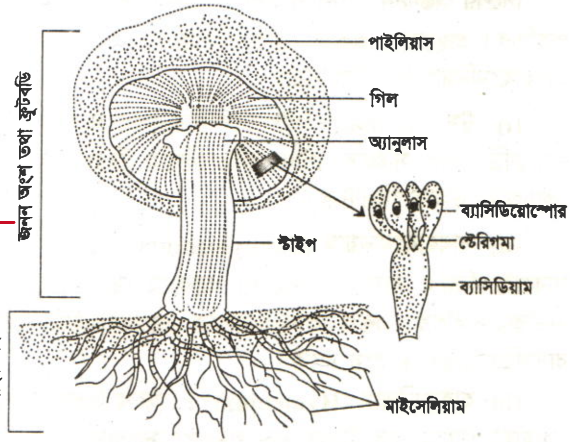

চিত্র ৫.৯ : *Agaricus* ছত্রাক-এর ফ্রুটবডি এবং অন্যান্য অংশ।

দৈহিক গঠন : একটি পূর্ণাঙ্গ *Agaricus* ছত্রাকের দেহকে দু'টি অংশে ভাগ করা যেতে পারে। **দৈহিক অংশ**

তথা **মাইসেলিয়াম** (mycelium) এবং জনন অংশ তথা **ফ্রুটবডি**। মাইসেলিয়াম অত্যন্ত শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট ও সূত্রাকার; মাটি বা জৈব বস্তুর একটু ভেতরে অবস্থান করে। হাইফিগুলো প্রস্থপ্রাচীর দিয়ে বিভক্ত। হাইফিগুলো সাদা বর্ণের, এরা আবাসস্থল থেকে খাদ্য শোষণ করে। হাইফার কোষগুলোতে দানাদার প্রোটোপ্লাজম, একাধিক নিউক্লিয়াস, ছোটো ছোটো কোষগহ্বর, সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে তেলবিন্দু থাকে। হাইফিগুলো পৃথক থাকতে পারে, বা কিছুসংখ্যক একসাথে জড়াজড়ি করে দড়ির মতো তৈরি করে। *Agaricus*-এর দড়ির মতো হাইফাল অংশকে **রাইজোমরফ** (rhizomorph) বলা হয়। একদিনে একটি মাশরুম এক কিলোমিটার দীর্ঘ হাইফি তৈরি করতে পারে।

জনন অংশ তথা ফ্রুটবডি (fruiting body) মাটি বা আবাদ মাধ্যম থেকে ওপরে বাড়তে থাকে। পরিণত অবস্থায় এর দুটি অংশ থাকে। গোড়ার দিকে কাণ্ডের ন্যায় অংশকে **স্টাইপ** (stipe) বলা হয় এবং ওপরের দিকে ছাতার ন্যায় অংশকে **পাইলিয়াস** (pileus) বলা হয়। তরুণ অবস্থায় পাইলিয়াসটি **ভেলাম** (Vellum) নামক একটি পাতলা ঝিল্লিময় আবরণে আবৃত থাকে। পাইলিয়াসের নিচের দিকে ঝুলন্ত অবস্থায় পর্দার ন্যায় অংশকে **গিল** (gills) বা **ল্যামেলি** (lamellae) বলে। স্টাইপের মাথায় একটি চক্রাকার অংশ থাকে যাকে **অ্যানুলাস** (annulus) বলে। ল্যামিলিতে অসংখ্য **ব্যাসিডিয়া** (basidia) সৃষ্টি হয়। প্রতিটি ব্যাসিডিয়াম উর্বর এবং ব্যাসিডিয়ামের শীর্ষে আঙুলের ন্যায় চারটি অংশের মাথায় একটি করে **ব্যাসিডিয়োস্পোর** (basidiospore) উৎপন্ন হয়। স্পোরগুলো অনুকূল পরিবেশে অঙ্কুরিত হয়ে নতুন মাইসেলিয়াম তৈরি করে।

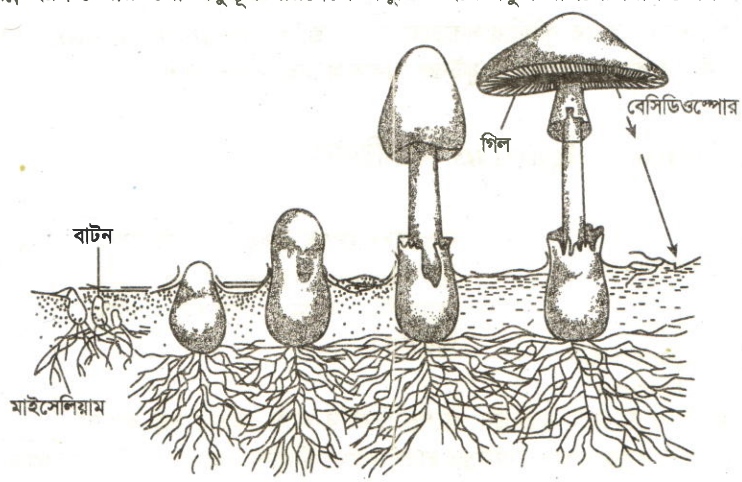

চিত্র ৫.১০ : মাটির নিচের মাইসেলিয়াম থেকে ফ্রুটবডি সৃষ্টির ধাপসমূহ

গিলের অন্তর্গঠন : গিল পাতলা পাতের মতো। গিলের অন্তর্গঠন বেশ জটিল প্রকৃতির। প্রস্থচ্ছেদ করলে একে তিনস্তরে বিভক্ত দেখা যায়; যথা– ট্রমা, সাবহাইমেনিয়াম ও হাইমেনিয়াম।

(i) ট্রমা (Trama) : গিলের কেন্দ্রীয় বন্ধ্যা অংশকে ট্রমা বলে। ঢিলাভাবে জড়াজড়ি করে সজ্জিত গৌণ মাইসেলিয়াম দিয়ে ট্রমা অংশ গঠিত। এর কোষগুলো ডাইক্যারিওটিক।

(ii) সাবহাইমেনিয়াম (Subhymenium) : ট্রমার উভয় দিকের অংশকে সাবহাইমেনিয়াম বলে। কোষগুলো আকারে ছোটো, গোলাকার এবং ২–৩ নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট। এরূপ কোষবিন্যাসকে **প্রোজেনকাইমা** বলে। এ অঞ্চল থেকে ব্যাসিডিয়াম উৎপন্ন হয়ে থাকে।

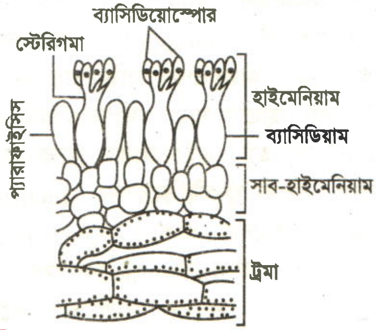

চিত্র ৫.১১ : গিলের তিনটি স্তর (ট্রমার এক পাশের অংশ দেখানো হয়েছে)।

(iii) হাইমেনিয়াম (Hymenium) : গিলের উভয় পাশের বহিঃস্থ স্তরকে হাইমেনিয়াম বলে। উর্বর এ স্তরের কোষগুলো সাবহাইমেনিয়াম হতে উত্থিত এবং লম্বভাবে সাজানো থাকে। এ স্তরেই গদাকার **ব্যাসিডিয়াম** উৎপন্ন হয়।

ব্যাসিডিওকার্প (Basidiocarp) : ব্যাসিডিওমাইসিটিস শ্রেণির ছত্রাকের ফ্রুটবডিকে ব্যাসিডিওকার্প বলে। কাজেই *Agaricus*-এর ফ্রুটবডিকেও ব্যাসিডিওকার্প বলা হয়। *Agaricus*-এর ব্যাসিডিওকার্প গোড়ায় দণ্ডের ন্যায় **স্টাইপ**, স্টাইপের মাথার দিকে অ্যানুলাস এবং মাথায় ছাতার ন্যায় **পাইলিয়াস** নিয়ে গঠিত। এছাড়াও এতে আছে **গিল** বা **ল্যামিলি**, গিলে অসংখ্য **ব্যাসিডিয়া** এবং প্রতিটি ব্যাসিডিয়ামের মাথায় ৪টি করে **ব্যাসিডিওস্পোর**। ভূনিম্নস্থ মাইসেলিয়াম অংশ বাদে ওপরে ব্যাঙের ছাতার ন্যায় অংশটুকুই *Agaricus*-এর ব্যাসিডিওকার্প।

অঙ্কুরোদগম : অনুকূল পরিবেশে ব্যাসিডিয়োস্পোর অঙ্কুরিত হয়ে মনোক্যারিওটিক প্রাথমিক মাইসেলিয়াম গঠন শুরু করে। সোমাটোগ্যামির মাধ্যমে প্রাথমিক মাইসেলিয়াম হতে গৌণ মাইসেলিয়াম উৎপন্ন হয়। পরে গৌণ মাইসেলিয়ামের সহায়তায় সৃষ্ট **রাইজোমর্ফ** দিয়ে প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করে।

পুষ্টি : জৈব পদার্থ শোষণ করে পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে।

জনন : *Agaricus* প্রধানত যৌন জনন প্রক্রিয়ায় জননকার্য সম্পন্ন করে। যৌন স্পোর উৎপাদনকারী অঙ্গের নাম **ব্যাসিডিয়াম** (basidium) এবং স্পোর এর নাম **ব্যাসিডিয়োস্পোর**।

Agaricus (মাশরুম) ছত্রাকের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

মাশরুম ছত্রাকের উপকারিতা (Advantages) :

১। খাদ্য হিসেবে : 'মাশরুম' বিভিন্ন ভিটামিন সমৃদ্ধ হওয়ায় পৃথিবীর বহুদেশে এটি সুপ্রিয় খাদ্য হিসেবে পরিচিত। এজন্য পৃথিবীর বহুদেশে এর চাষ হয়। বর্তমানে বাংলাদেশেও এর ব্যাপক চাষ শুরু হয়েছে। এটি টাটকা ও সংরক্ষিত উভয় অবস্থায় বাজারে বিক্রি হয়। বাংলাদেশের বড়ো বড়ো হোটেলগুলোতে খাদ্য হিসেবে, বিশেষ করে স্যুপ তৈরিতে মাশরুম ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে আমাদের গ্রামীণ সমাজেও মাশরুম ব্যবহার জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছে। খাদ্য হিসেবে বাংলাদেশে (মানিকগঞ্জ ও সাভার) *Volvariella* ও *Pleurotus* গণভুক্ত কয়েকটি মাশরুম প্রজাতির চাষ হচ্ছে। পুষ্টিগত দিক থেকে *Agaricus campestris* ও *A. bisporus* অত্যন্ত উঁচুমানের এবং সুস্বাদু। টাটকা মাশরুমে নানা ধরনের ভিটামিন পাওয়া যায়; যেমন-থায়ামিন, রিবোফ্লোবিন, Vit – C, D, K ও প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড। আমেরিকা ও ইউরোপে *Agaricus brunnescens* (= *A. bisporus*) মাশরুম প্রজাতির ব্যাপক চাষ হয়। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর ৭৮০ মিলিয়ন পাউন্ড mushroom উৎপাদিত হয়।

২। মৃত্তিকার পুষ্টি বৃদ্ধিতে : মাশরুম (*Agaricus*) মৃতজীবী তাই বিভিন্ন ধরনের জটিল দ্রব্যকে ভেঙে মৃত্তিকার পুষ্টি বৃদ্ধি করে থাকে।

৩। শিল্প ও বাণিজ্যে : 'মাশরুম' এর চাষ বেশ লাভজনক কুটির শিল্পে পরিণত হয়েছে।

৪। দূষণরোধে : মাশরুম পরিবেশ থেকে শিল্পবর্জ্য, তেল, পেস্টিসাইড অপসারণে ব্যবহৃত হয়।

৫। ওষুধি গুণাবলি :

(i) এতে আঁশ বেশি থাকায় এবং শর্করা ও চর্বি কম থাকায় ডায়াবেটিস রোগীর জন্য একটি আদর্শ খাবার।

(ii) এতে শর্করা, প্রোটিন, চর্বি, ভিটামিন, খনিজ লবণ (Ca, K, P, Fe ও Cu) এমন সমন্বয়ে আছে যা শরীরের ইমিউন সিস্টেমকে উন্নত করে। যার ফলে গর্ভবতী মা ও শিশুরা এটি নিয়মিত খেলে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায়।

(iii) এতে প্রচুর উৎসেচক (এনজাইম) আছে যা হজমে সহায়ক, খাবারে রুচি বাড়ে এবং পেটের পীড়া নিরাময় করে।

(iv) এতে লোভাস্টানিন, এনটাডেনিন ও ইরিটাডেনিন থাকে যা শরীরের কোলেস্টেরল কমানোর জন্য অন্যতম উপাদান। মাশরুম নিয়মিত খেলে উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগ নিয়ন্ত্রিত থাকে। ক্যান্সার ও টিউমার প্রতিরোধ করে।

(v) **ইঁদুরের ওপর আমাদের নিজস্ব গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে মাশরুম ডায়াবেটিস কমাতে ভূমিকা রাখে।**

৬। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে : বিশ্বের অনেক দেশে মাশরুম অত্যন্ত দামি খাবার। ব্যাপকভাবে মাশরুম চাষ ও রপ্তানির মাধ্যমে আমরা অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি।

মাশরুম ছত্রাকের অপকারিতা :

১। বিষাক্ততা : অপরিচিত বুনো মাশরুম খাওয়া ঠিক নয়, কারণ কিছু কিছু প্রজাতি; যেমন–*Agaricus xanthodermus* বেশ বিষাক্ত। সবচেয়ে বিষাক্ত হলো *Amanita virosa* এবং *A. phalloides* প্রজাতি। বিষাক্ত মাশরুম খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করলে মানুষ ও প্রাণীর মৃত্যু হতে পারে।

২। বিনাশী কার্য : মাশরুম কাঠের গুড়ি, খড়, বাঁশ প্রভৃতির ওপর জন্মিয়ে তাদের ক্ষতি সাধন করে থাকে।

৩। জৈব বস্তুর ঘাটতি : মাশরুম জন্মানো স্থানে জৈব বস্তুর অভাব দেখা দেয়। এতে মাটির উর্বরা শক্তি বিনষ্ট হয়।

বিষাক্ত মাশরুম চেনার উপায় : ১। বেশির ভাগ উজ্জ্বল বর্ণের প্রজাতিগুলো বিষাক্ত হয়ে থাকে। ২। অম্লগন্ধযুক্ত ও ঝাঁঝালো প্রজাতিগুলো বিষাক্ত। ৩। বিষাক্ত প্রজাতিগুলোর ব্যাসিডিওস্পোর বেগুনি রঙের। ৪। বিষাক্ত মাশরুম কখনো প্রখর রোদে জন্মায় না। ৫। কাঠের ওপর জন্মায় এমন প্রজাতিগুলো বিষাক্ত।

শৈবাল ও ছত্রাক-এর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	শৈবাল	ছত্রাক
১। আবাসস্থল	এদের অধিকাংশ পানিতে বাস করে অর্থাৎ জলজ।	এদের অধিকাংশ স্থলে বাস করে অর্থাৎ স্থলজ।
২। বর্ণ কণিকা	কোষে ক্লোরোফিল আছে।	কোষে ক্লোরোফিল নেই।
৩। খাদ্য তৈরি	সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করে, তাই স্বভোজী।	এরা নিজের খাদ্য তৈরি করতে পারে না, তাই পরভোজী। খাদ্যের জন্য অন্য জীবদেহ বা জৈব বস্তুর ওপর নির্ভরশীল।
৪। আলোক নির্ভরতা	এদের জন্য আলো অত্যাবশ্যক (সালোকসংশ্লেষণ করে বলে)।	এদের জন্য আলো অত্যাবশ্যক নয়।
৫। কোষ প্রাচীর	এদের কোষ প্রাচীর প্রধানত সেলুলোজ দিয়ে গঠিত।	এদের কোষ প্রাচীর কাইটিন দিয়ে গঠিত।
৬। সঞ্চিত খাদ্য	এদের সঞ্চিত খাদ্য শ্বেতসার (শর্করা)।	এদের সঞ্চিত খাদ্য গ্লাইকোজেন ও তৈলবিন্দু।
৭। জননাঙ্গ	যৌন জননাঙ্গগুলো ক্রমাগত সরল অবস্থা হতে জটিল অবস্থায় পরিণত হয়েছে।	যৌন জননাঙ্গ জটিল অবস্থা হতে ক্রমাগত সরলতর অবস্থায় প্রাপ্ত হয়েছে।
৮। রোগ সৃষ্টি	এরা সাধারণত জীবদেহে রোগ সৃষ্টি করে না।	এদের অনেক প্রজাতি জীবদেহে রোগ সৃষ্টি করে।

ব্যবহারিক : *Agaricus*-এর ফ্রুটবডির বাহ্যিক গঠন পর্যবেক্ষণ।

উপকরণ : *Agaricus*-এর ফ্রুটবডির তাজা নমুনা/গ্লাস জার-এ রক্ষিত নমুনা/শুকনো নমুনা, ব্যবহারিক শিট, পেন্সিল ইত্যাদি।

কার্যপদ্ধতি : প্রদত্ত নমুনাটি পর্যবেক্ষণ করে চিহ্নিত চিত্র আঁকতে হবে এবং শনাক্ত করতে হবে।

সিদ্ধান্ত : প্রদত্ত নমুনাটি *Agaricus*-এর ছত্রাকের ফ্রুটবডি; কারণ—

১। নমুনাটি ছাতার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট।

২। এটি অসবুজ।

৩। দেহ দণ্ডাকার স্টাইপ এবং প্রসারিত পাইলিয়াস-এ বিভক্ত।

৪। স্টাইপের মাথায় এবং পাইলিয়াসের নিচে চক্রাকার অ্যানুলাস আছে।

৫। পাইলিয়াসের নিম্নতলে ঝুলন্ত গিল আছে।

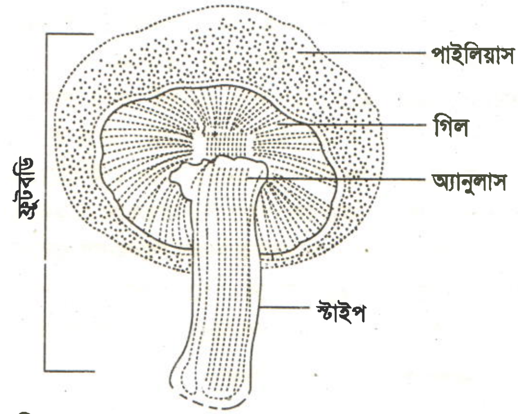

চিত্র ৫.১১.১ : *Agaricus* ছত্রাক-এর ফ্রুটবডি।

ছত্রাকঘটিত রোগ (Fungal diseases)

ছত্রাক দ্বারা উদ্ভিদ ও প্রাণীর অনেক প্রকার রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এর ফলে দেশের অর্থনীতির ব্যাপক ক্ষতি হয়। নিচে দু'টি ছত্রাকঘটিত রোগ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

গোল আলুর বিলম্বিত ধ্বসা রোগ (Late blight disease of potato) : গাছের পাতা, কাণ্ড, ফুল ইত্যাদি অঙ্গ ক্ষত হয়ে শুকিয়ে যাওয়াকে বলা হয় ধ্বসা বা **ব্লাইট** (blight)। আলু গাছে দু' ধরনের ব্লাইট রোগ হয়ে থাকে; একটি হলো **লেট ব্লাইট**, অপরটি হলো **আর্লি ব্লাইট**। আর্লি ব্লাইট *Alternaria solani* দিয়ে হয়ে থাকে। আলু গাছের সবচেয়ে ক্ষতিকারক রোগ হলো লেট ব্লাইট, যা বাংলায় বিলম্বিত ধ্বসা রোগ হিসেবে পরিচিত। মড়ক আকারে দেখা দিলে লেট ব্লাইটের কারণে আলুর ফলন সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে।

এ রোগটি সম্ভবত প্রথমে দক্ষিণ আমেরিকাতে শুরু হয়েছিল। পরে উত্তর আমেরিকা, কানাডা, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ হয়ে বিশ্বের প্রায় সব অঞ্চলেই ছড়িয়ে পড়ে। শীতপ্রধান অঞ্চলেই রোগটির প্রকোপ বেশি। আলুর লেট ব্লাইট রোগের কারণে ১৮৪০ দশকের মাঝের দিকে (১৮৪৩–১৮৪৭) আয়ারল্যান্ডে ভয়াবহ **আইরিশ দুর্ভিক্ষ** (Irish Potato Famine) দেখা দেয়, যার ফলে প্রায় দশ লক্ষ লোক না খেয়ে মারা যায় এবং অভাবে পড়ে আরো ২০ লক্ষ লোক দেশ ত্যাগ করে। ঐ সময় ইউরোপের প্রায় সব দেশেই আলুর মড়ক দেখা দিয়েছিল কিন্তু অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল আয়ারল্যান্ড, কারণ 'Irish Lumper' নামক আলুর একটি মাত্র প্রকরণই তারা অধিক চাষ করতো। লেটব্লাইট রোগে আলুর ফসলহানির কারণে জার্মানিতেও ৭ লক্ষ লোক মারা গিয়েছিল।

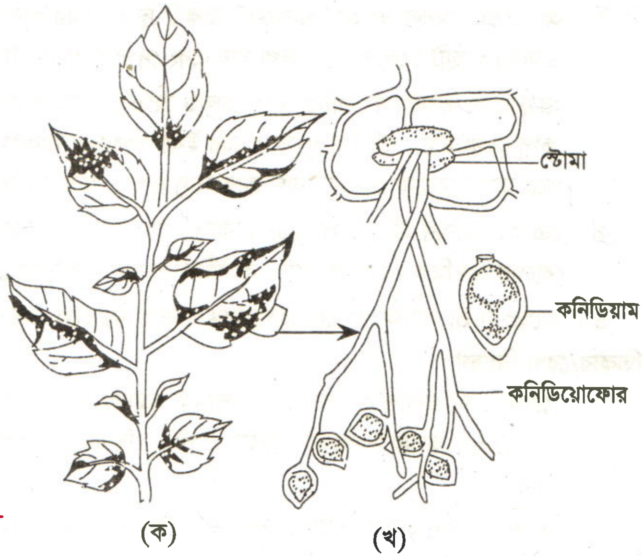

চিত্র ৫.১২ : *Phytophthora infestans* ছত্রাক
(ক) আক্রান্ত আলু পাতা, (খ) কনিডিয়োফোর ও কনিডিয়া

রোগজীবাণু (Pathogen) : আলুর বিলম্বিত ধ্বসা রোগের কারণ হলো আলু গাছে *Phytophthora infestans* নামক ছত্রাকের আক্রমণ। *Phytophthora,* Phycomycetes MAT14-15 শ্রেণির ছত্রাক। ছত্রাক দেহ মাইসেলিয়াম এবং সিনোসাইটিক। এরা পোষক দেহের আন্তঃকোষীয় ফাঁকে অবস্থান করে এবং **হস্টোরিয়া** (haustoria) নামক বিশেষ হাইফার মাধ্যমে পোষক কোষ থেকে খাদ্যরস শোষণ করে বেঁচে থাকে। পরবর্তীতে আন্তঃকোষীয় হাইফা থেকে বায়বীয় শাখা পাতার নিম্নত্বকের স্টোম্যাটা দিয়ে গুচ্ছাকারে বের হয়ে আসে। বায়বীয় এ শাখাগুলোকে **কনিডিয়োফোর** বলে। কনিডিয়োফোর শাখান্বিত এবং প্রতি শাখার মাথায় একটি **কনিডিয়াম** (বহুবচনে কনিডিয়া) উৎপন্ন হয়। কনিডিয়াম হলো অযৌন স্পোর। কনিডিয়া দেখতে কতকটা উপবৃত্তাকার বা ডিম্বাকার, পুরুপ্রাচীর বিশিষ্ট কিন্তু মাথাটা পাতলা ও অর্ধস্বচ্ছ। প্রতিটি কনিডিয়ামে একাধিক নিউক্লিয়াস, প্রচুর দানাদার প্রোটোপ্লাজম এবং সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে **তৈলবিন্দু** থাকে।

P. infestans ডিপ্লয়েড, ক্রোমোসোম ১২ (১১–১৩), এর জিনোম সিকুয়েন্সিং সম্পন্ন হয়েছে ২০০৯ সালে। এতে বেসপেয়ার আছে ২৪০ মিলিয়ন, জিন শনাক্ত করা হয়েছে ১৮,০০০।

তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত বেশি এবং বাতাসে জলীয়বাষ্প কম থাকলে কনিডিয়া সরাসরি অঙ্কুরিত হয়ে নতুন টিস্যু বা নতুন গাছকে আক্রমণ করে। তবে তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত কম এবং বাতাসে জলীয়বাষ্প অধিক থাকলে (মেঘলা আবহাওয়া, ঘন কুয়াশা, বৃষ্টি ইত্যাদি সময়ে) প্রতিটি কনিডিয়াম থেকে অনেকগুলো দ্বিফ্ল্যাজেলাযুক্ত জুস্পোর উৎপন্ন হয় এবং পানির সাহায্যে বা বাতাসের সাহায্যে আশপাশের জমিতে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে রোগটি আশেপাশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং ফসলে মড়ক আকারে দেখা দেয়।

বাংলাদেশে কখনো কখনো এ রোগটি হতে দেখা যায়। শীতকালে তাপমাত্রা অধিক নিচে নেমে এলে এবং বাতাসে জলীয়বাষ্প অধিক থাকলে (সাধারণত কিছুদিন ধরে ঘন কুয়াশা বা মৃদু বৃষ্টিপাত, হালকা বাতাস থাকলে) এ রোগটি ফসলের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

রোগ লক্ষণ (Symptoms) : আলুর বিলম্বিত ধ্বসা রোগের লক্ষণগুলো নিম্নরূপ :

১। প্রথম পাতায় সবুজ-ধূসর বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ (spot) দেখা যায়। দাগগুলো পরে অপেক্ষাকৃত বড়ো হয়ে হালকা বাদামি বর্ণের হয় এবং শেষ পর্যন্ত লালচে কালো বা কালো-বাদামি বর্ণের হয়। গাছের বয়স্ক পাতার কিনারায় বা অগ্রভাগে পানি ভেজা দাগ প্রথম প্রকাশ পায়। পরে কালচে ভেজা দাগসহ পচন সৃষ্টি হয়।

২। পরে আক্রান্ত স্থানে সূক্ষ্ম মখমলের মতো আস্তরণ সৃষ্টি হয়। এ সময় আক্রান্ত পাতার নিম্নত্বকের পত্ররন্ধ্র দিয়ে কনিডিয়োফোর বের হয়। অণুবীক্ষণযন্ত্রে কনিডিয়োফোর দেখে ছত্রাক আক্রমণ নিশ্চিত হওয়া যায়।

৩। আবহাওয়া মেঘলা ও আর্দ্র থাকলে ছত্রাকটি দ্রুত বিস্তার লাভ করে এবং পুরো পাতা, এমনকি কাণ্ডও আক্রান্ত হয়। এ সময় গাছটি ঢলে পড়তে দেখা যায় এবং দেখতে অনেকটা সিদ্ধি গাছের মতো মনে হয়।

৪। আক্রমণের প্রকটতায় মাটির নিচে আলুও আক্রান্ত হতে পারে। আক্রান্ত আলুর ত্বকের নিচে লালচে-বাদামি কালো ছোপ দেখা যায়। এটি পরে সেকেন্ডারি ইনফেকশনের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়াল রট (পচন)-এ পরিণত হয় এবং আলু পচে যায়। কোনো কোনো রোগাক্রান্ত আলু দৃশ্যত ভালো দেখা গেলেও কোল্ডস্টোরেজ-এ পচে যায়।

৫। ছত্রাক আক্রমণ তীব্র হলে আক্রান্ত আলু গাছ থেকে পচা ডিমের ন্যায় দুর্গন্ধ বের হয়। রোগাক্রান্ত আলুবীজ থেকে রোগের প্রাথমিক সংক্রমণ ঘটে। কনিডিয়া ও জুস্পোর দিয়ে রোগের সেকেন্ডারি সংক্রমণ ঘটে।

৬। গাছের পাতা পরীক্ষা করলে রোগাক্রান্ত পাতার নিম্নতলে সাদা সুতার মতো (সূত্রাকার) মাইসেলিয়াম দেখা যায়।

প্রতিকার/রোগ নিয়ন্ত্রণ :

১। রোগ লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথেই ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হবে। প্রথমেই ১% **বোর্দোমিশ্রণ** (Bordeux mixture : কপার সালফেট, লাইম ও পানি) ছিটিয়ে বা কপার-লাইম ডাস্ট প্রয়োগ করে রোগের বিস্তার রোধ করা যায়।

২। পানি ও পানি প্রবাহ রোগের সেকেন্ডারি বিস্তার ঘটায়। তাই পানি সেচ সীমিত রাখতে হবে। নাইট্রোজেন সারও সীমিত ব্যবহার করা দরকার।

৩। আলু চাষের জন্য সুস্থ ও জীবাণুমুক্ত বীজ ব্যবহার করতে হবে। অবশ্যই রোগমুক্ত এলাকা থেকে আলু বীজ সংগ্রহ করতে হবে। কোল্ডস্টোরেজ-এ রাখা বীজ ব্যবহার অপেক্ষাকৃত উত্তম। মনে রাখতে হবে রোগাক্রান্ত বীজ থেকেই রোগের প্রাথমিক আক্রমণ ঘটে।

৪। জমি থেকে আলু ফসল ওঠানোর পর সব পরিত্যক্ত আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

৫। একই জমিতে প্রতি বছর আলু চাষ না করে ১/২ বছর পর পর চাষ করলে রোগের বিস্তার কম হতে পারে।

৬। ছত্রাক প্রতিরোধক্ষম 'জাত' লাগাতে হবে।

৭। আগাম জাত চাষ করলে রোগ আক্রমণের আগেই ফসল তুলে নেয়া যায়।

৮। এলাকা ও জমির ধরন অনুযায়ী জাত নির্বাচন করতে হবে। স্থানীয় জাত ফলন কম হলেও সাধারণত রোগপ্রবণ নয়।

৯। পাতা থেকে আলুতে যাতে রোগ সংক্রমণ না হয়, সেজন্য আলু সংগ্রহের পূর্বে **সাইনক্স** বা অ্যামোনিয়াম থায়োসায়ানেট ওষুধ ছিটিয়ে গাছের পাতা ঝড়িয়ে ফেলতে হয়।

১০। যেসব স্থানে এ রোগ হয় সেখানে গাছ ১৪–১৬ cm বড়ো হলেই ডায়থেন এম-৪৫ বা বোর্দো মিক্সচার (Bordaux mixture– কপার সালফেট, লাইম ও পানি) নামক ছত্রাকনাশক ১৫ দিন পরপর ছিটাতে হবে।

১১। খোলামেলা জমিতে আলু চাষ করা এবং আলু গাছের সারির মধ্যে পর্যাপ্ত ফাঁক রাখা।

দাদরোগ বা ডার্মাটোফাইটোসিস (Ringworm or Dermatophytosis)

দাদরোগ একটি ছোঁয়াচে ছত্রাকঘটিত চর্ম রোগ। আক্রমণের জন্য দায়ী ছত্রাক ত্বক, চুল ও নখে উপস্থিত কেরাটিন (Keratin) নামক প্রোটিন আহার করে। উষ্ণ ও আর্দ্র পরিবেশে এ রোগটি দ্রুতবিস্তার লাভ করে। বাংলাদেশে এ রোগটি দেশের সব অঞ্চলেই বিস্তৃত। একে সংস্কৃত ভাষায় দদ্রু রোগ, আর ইংরেজি ভাষায় ringworm বলা হয়। যদিও এটি কোনো worm দ্বারা সংঘটিত রোগ নয়। দাদরোগ সব বয়সের লোকেরই হতে পারে, তবে ছোটো ছেলেমেয়েরাই অধিক সংখ্যায় আক্রান্ত হয়। হাসপাতাল, এতিমখানা বা হেফজখানা, যেখানে ছোটো ছেলেমেয়েরা অল্প জায়গায় অধিক সংখ্যায় বাস করে সেখানে দাদরোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

রোগের কারণ : দাদ ছত্রাকঘটিত রোগ। উদ্ভিদ পরজীবী দ্বারা হয় বলে চিকিৎসা শাস্ত্রে একে **tinea** বলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই *Trichophyton (T. rubrum, T. verrucosum)* নামক ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে। তাই রোগটি **tinea trichophytina** বা **trichophytosis** নামেও পরিচিত। এছাড়া *Microsporum (M. canis), Epidermophyton (E. floccosum)* গণের ছত্রাক দিয়েও দাদরোগ হতে পারে।

সংক্রমণ : সাধারণত ঘামে ভেজা শরীর, অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন শরীর, দীর্ঘ সময় ভেজা থাকে এমন শরীর, ত্বকে ক্ষত স্থান আছে এমন শরীর সহজে এ ছত্রাকের স্পোর (বা হাইফা) দ্বারা আক্রান্ত হয়। এ রোগ-জীবাণুর সুপ্তিকাল ৩-৫ দিন। সাধারণত আক্রান্ত হওয়ার ৩–৫ দিন পর রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায়। দেহের যেকোনো অংশেই দাদরোগ হতে পারে, তবে মুখমণ্ডল এবং হাতে অধিক দেখা যায়। উরু, মাথার খুলি, নখ ইত্যাদিও আক্রান্ত হয়। মাথার খুলির দাদরোগ অপেক্ষাকৃত মারাত্মক। আক্রান্ত স্থানের নামানুসারে ডাক্তারি পরিভাষায় দাদরোগটি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হয়।

রোগ লক্ষণ

১। প্রথমে আক্রান্ত স্থানে ছোটো ছোটো লাল গোটা হয় এবং সামান্য চুলকায়।
২। পরে আক্রান্ত স্থানে বাদামি বর্ণের আঁইশ হয় এবং স্থানটি বৃত্তাকারে বড়ো হতে থাকে।
৩। ক্রমে সুনির্দিষ্ট কিনারসহ বৃত্তের আকার বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং মাঝখানের ত্বক স্বাভাবিক হয়ে আসে। চুলকানি বৃদ্ধি পায়।
৪। চুলকানোর পর আক্রান্ত স্থানে জ্বালা হয় এবং আঁঠালো রস বের হয়।
৫। মাথায় হলে স্থানে স্থানে চুল ওঠে যায়, নখে হলে দ্রুত নখের রং বদলায় এবং শুকিয়ে খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙ্গে যেতে পারে।
৬। আক্রান্ত স্থানে এটি প্রায়শই **রিং**-এর মতো গঠন সৃষ্টি হয়।

রোগবিস্তার : এটি ছোঁয়াচে রোগ। অতিসহজেই রোগী থেকে সুস্থ দেহে বিস্তার লাভ করতে পারে। রোগীর চিরুনি, তোয়ালে, বিছানা ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে রোগটি দ্রুত সুস্থদেহে ছড়িয়ে পড়ে। রোগাক্রান্ত পোষা বিড়ালের মাধ্যমে অধিক ছড়ায়। উষ্ণ ও ভেজা স্থানে জীবাণুর সংক্রমণ বেশি হয়।

প্রতিকার/রোগ নিয়ন্ত্রণ

১। আক্রান্ত স্থান পরিষ্কার ও শুকনো রাখতে হবে।
২। প্রতিদিন রোগীর বিছানাপত্র ও জামাকাপড় সোডা পানি দিয়ে সিদ্ধ করে ধুতে হবে।
৩। এমন কাপড় পরা যাবে না যা আক্রান্ত স্থানে ঘর্ষণ করে।
৪। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী এন্টিফাংগাল ক্রিম বা ড্রাইপাওডার ব্যবহার করতে হবে।
৫। রোগাক্রান্ত পোষা প্রাণী থেকে সাবধান থাকতে হবে।
৬। মাথায় দাদ হলে মাথা ন্যাড়া করে সেলিসাইলিক অ্যাসিডঘটিত মলম কিছুদিন ব্যবহার করতে হবে।
৭। শরীরের অন্যান্য স্থানে দাদ হলে আয়োডিন, বেনজোয়িক অ্যাসিড ব্যবহার করা ভালো।

চিকিৎসা : চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ ব্যবহার করতে হবে। সাধারণত ৩–৪ সপ্তাহের মধ্যেই দাদরোগ আরোগ্য হয় এবং এ রোগে সাধারণত এন্টিফাংগাল ক্রিমই (Terbinafine/Miconazole ক্রিম) ব্যবহার করা হয়। মাথার দাদ চিকিৎসা অপেক্ষাকৃত সময়সাপেক্ষ। মলমজাতীয় ওষুধে রোগ না সারলে খাবার ওষুধ (Griseofulvin/Itraconazole

ট্যাবলেট) ব্যবহার করতে হতে পারে। **আক্রান্ত স্থান ভালো করে চুলকিয়ে দাদ মর্দন (*Cassia alata*) গাছের পাতার রস বা মণ্ড লাগালে ২/৩ দিনেই দাদ ভালো হয়। এটি পরীক্ষিত।** *Cassia tora, Cassia sophera*-র পাতাও উপকারী।

প্রতিরোধ

১। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। ২। ত্বক যেন ভেজা না থাকে তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। ৩। রোগীর ব্যবহৃত চিরুনি, তোয়ালে, বিছানা, জামা-কাপড় ব্যবহার করা যাবে না। ৪। চুল কাটার পর নিয়মিত মাথা পরিষ্কার রাখতে হবে ও শুকনো রাখতে হবে। ৫। পোষা প্রাণীর দেহের ন্যাড়া স্থান থেকে সাবধান থাকতে হবে। ৬। গেঞ্জি ও জাঙ্গিয়া নিয়মিত পরিষ্কার করে ব্যবহার করা দরকার।

জটিলতা : চুলকানো স্থানে ব্যাকটেরিয়্যাল ইনফেকশন হয়ে জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রমিত হলে আক্রান্ত স্থান ফোলে যায়, পুঁজ সৃষ্টি হয়, জ্বর হতে পারে, পুঁজ বা রস গড়িয়ে পড়তে পারে। এমন অবস্থায় অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের প্রয়োজন হতে পারে।

লাইকেন (Lichen)–শৈবাল ও ছত্রাকের সহাবস্থান

আমরা শৈবাল ও ছত্রাক সম্বন্ধে জেনেছি। উদ্ভিদজগতে এরা পৃথক রাজ্যের বাসিন্দা হলেও প্রকৃতিতে শৈবাল ও ছত্রাককে একই সাথে **সিমবায়োটিক** সহঅবস্থানে দেখা যায়। **শৈবাল ও ছত্রাক মিলিতভাবে সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের একজাতীয় উদ্ভিদের সৃষ্টি করে যাকে বলা হয় লাইকেন।** লাইকেন হলো ছত্রাক (স্যাক ফানজাই বা ক্লাব ফানজাই) এবং এককোষী শৈবাল বা সায়ানোব্যাকটেরিয়ার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এসোসিয়েশনে সৃষ্ট বিশেষ প্রকৃতির থ্যালয়েড গঠন। লাইকেন স্বয়ংসম্পূর্ণ, বিষমপৃষ্ঠ, থ্যালয়েড, অপুষ্পক উদ্ভিদ। সারা পৃথিবীতে প্রায় ৪০০টি গণ এবং ১৭,০০০ লাইকেন প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। **দুটি ভিন্ন প্রজাতির জীবের মধ্যে যখন এমন সম্পর্ক স্থাপিত হয় যে তাদের ঘনিষ্ঠভাবে সহাবস্থানের ফলে একে অন্যের নিকট হতে উপকৃত হয় তখন তাদের এ ধরনের সম্পর্ককে মিথোজীবিতা** (symbiosis) বলে। **শৈবাল ও ছত্রাক পরস্পর মিথোজীবী বা অন্যোন্যজীবীরূপে (symbiotically)** বসবাস করে। **এ প্রকার বন্ধনে উভয়েই একে অপরের দ্বারা উপকৃত হয়। লাইকেনে তাদের অবস্থান ও সম্পর্ককে মিথোজীবিতা এবং জীব দুটিকে মিথোজীবী জীব বলে।** লাইকেনের মোট ভরের ৫–১০% শৈবালের। (Lichen শব্দটি এসেছে ল্যাটিন *Leichen* থেকে যার অর্থ হলো "শৈবালতুল্য ছত্রাক বিশেষ।")

লাইকেনের বাসস্থান : লাইকেন এমন একটি সম্প্রদায় যারা এমন সব পরিবেশে জন্মাতে পারে, যেখানে অন্য আর কোনো জীব বেঁচে থাকতে পারে না। যেমন– অনুর্বর, বন্ধ্যা, বালু বা পাথরের মতো আবাসে এরা স্বাচ্ছন্দ্যে জন্মাতে পারে। এরা গাছের বাকল, সজীব পাতা, বন্ধ্যা মাটি, পাকা দেয়াল, ক্ষয়প্রাপ্ত কাঠের গুড়ি ইত্যাদি বস্তুর ওপর জন্মে থাকে। তুন্দ্রা অঞ্চল, মরু অঞ্চল, নীরস পর্বতগাত্রসহ সমস্ত প্রতিকূল অবস্থানে এরা জন্মাতে পারে। তাই লাইকেনকে **বিশ্বজনীন (Cosmopolitan) উদ্ভিদ** বলা হয়।

লাইকেনের বৈশিষ্ট্য : লাইকেনের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। সেগুলো নিম্নরূপ:

১। লাইকেন একটি দ্বৈত সংগঠন। কারণ একটি শৈবাল ও একটি ছত্রাক সদস্য মিলিতভাব এ সংগঠন তৈরি করে।
২। ছত্রাক থ্যালাসের কাঠামো তৈরি করে এবং কাঠামোর ভেতরে শৈবাল আবৃত অবস্থায় থাকে।
৩। আকৃতিগতভাবে লাইকেন থ্যালয়েড, চ্যাপ্টা, বিষমপৃষ্ঠ অথবা শাখা-প্রশাখা যুক্ত হয়।
৪। এরা অধিকাংশই ধূসর বর্ণের তবে সাদা, কালো, কমলা, হলুদ ইত্যাদি বর্ণেরও হয়ে থাকে।
৫। এরা **স্বভোজী** তাই স্বয়ংসম্পূর্ণ।
৬। লাইকেনের উভয় জীবে অঙ্গজ ও অযৌন জনন ঘটে। কিন্তু যৌন জনন শুধুমাত্র ছত্রাক সদস্যের ঘটে।
৭। লাইকেন অনুর্বর বন্ধ্যা মাধ্যমেও জন্মে, যেখানে অন্য কোনো জীব সম্প্রদায় জন্মাতে পারে না।
৮। কঠিন শিলাতেও মাটি গঠনে এরা অগ্রদূত হিসেবে ভূমিকা পালন করে।
৯। থ্যালাসের নিচের দিকে রাইজয়েডের মতো **রাইজাইন** থাকে, যা দিয়ে পানি শোষণ করে।
১০। এরা বায়ুদূষণের প্রতি উচ্চমাত্রায় সংবেদনশীল।

লাইকেনের গঠন এবং ছত্রাক ও শৈবালের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

লাইকেন সমাঙ্গদেহী, এদের অধিকাংশই ধূসর বর্ণের; তবে সাদা, কমলা-হলুদ, সবুজ, পীতাভ-সবুজ অথবা কালো ইত্যাদি বর্ণের হতে পারে। এরা অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকার হতে কয়েক ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ হতে পারে। একটি লাইকেন দুটি জীবীয় উপাদান নিয়ে গঠিত। একটি শৈবাল যাকে **ফটোবায়োন্ট** (photobiont) বলে। এরা নীলাভ-সবুজ শৈবাল বা সবুজ শৈবালের অন্তর্ভুক্ত। অপরটি ছত্রাক যাকে **মাইকোবায়োন্ট** (mycobiont) বলে। এরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অ্যাসকোমাইসিটিস শ্রেণির এবং কিছু কিছু ব্যাসিডিওমাইসিটিস শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। লাইকেনে শৈবাল ও ছত্রাক উভয়ই উপকৃত হয় এবং কেউ কারও অপকার করে না। এরূপ উপকারভিত্তিক সম্পর্ককে **মিথোজীবিতা** বা অন্যোন্যজীবিতা (symbiosis) বা মিউচুয়ালিজম (mutualism) বলে।

লাইকেনে শৈবাল যেভাবে উপকৃত হয়—

• শৈবাল ছত্রাকের দেহে আশ্রয় গ্রহণ করে। • ছত্রাক পরিবেশ থেকে পানি, খনিজ লবণ, জলীয়বাষ্প ইত্যাদি শোষণ করে শৈবালকে প্রদান করে। • ছত্রাক চারদিক থেকে শৈবালকে ঘিরে রাখে অর্থাৎ ছত্রাকের দেহে অবস্থানের কারণে শৈবালের দৈহিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। • ছত্রাকের দেহে শারীরবৃত্তীয় কাজের ফলে সৃষ্ট CO_2 ও পানি শৈবাল সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কাজে লাগায়।

লাইকেনে ছত্রাক যেভাবে উপকৃত হয়—

• ছত্রাক নিজ দেহে আশ্রয়দানের বিনিময়ে শৈবাল কর্তৃক উৎপাদিত খাদ্য হস্টোরিয়ামের সাহায্যে গ্রহণ করে বেঁচে থাকে অর্থাৎ শৈবালের প্রস্তুতকৃত খাদ্য উভয়েই ভাগ করে গ্রহণ করে। • ছত্রাকের শারীরবৃত্তীয় কাজের ফলে সৃষ্ট বর্জ্য ও জলীয়বাষ্প দেহ থেকে অপসারণের জন্য ছত্রাককে কোনো ধরনের শক্তির অপচয় করতে হয় না।

লাইকেনে ছত্রাকের চেয়ে শৈবালের গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ লাইকেনে ছত্রাক সদস্য এককভাবে বেঁচে থাকতে পারে না। কিন্তু শৈবাল সদস্য এককভাবে বেঁচে থাকতে পারে। লাইকেনে শৈবালের চেয়ে ছত্রাক বেশি সুবিধা ভোগ করে এবং অন্যদিকে শৈবালটি ছত্রাকের কৃতদাস হিসেবে অবস্থান করে বলে কোনো কোনো উদ্ভিদবিজ্ঞানী এরূপ সহাবস্থানকে বিশেষ ধরনের মিথোজীবিতা বা **হেলোটিজম** (helotism) বলে আখ্যায়িত করেছেন। অধিকাংশ লাইকেনের ক্ষেত্রে ছত্রাক সদস্যটি শৈবাল কোষের অভ্যন্তরে **হস্টোরিয়া** নামক শোষক অণুসূত্র প্রবেশ করিয়ে পুষ্টি সংগ্রহ করে বলে এরূপ সহাবস্থানকে অনেকে **আংশিক পরজীবিতা** বলে উল্লেখ করেছেন।

লাইকেনের শ্রেণিবিভাগ

(ক) বাসস্থানের ভিত্তিতে লাইকেনের শ্রেণিবিভাগ :

১। **কর্টিকোলাস (corticolous) :** এরা গাছের বাকল বা কাণ্ডের ওপরে জন্মে। যেমন- *Graphis, Parmelia*।

২। **টেরিকোলাস (terricolous) :** উষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চলের মাটিতে জন্মে। যেমন- *Collema tenax, Cora pavonia*।

৩। **স্যাক্সিকোলাস (sexicolous) :** শীতপ্রধান অঞ্চলে পাথরের বা শিলাখণ্ডের ওপর জন্মায়। যেমন- *Coloplecta, Xanthoria*।

৪। **লিগনিকোলাস (lignicolous) :** এরা সরাসরি ভেজা কাঠের ওপর জন্মায়। যেমন- *Calicicum, Piptoporus*।

৫। **ওমনিকোলাস (omnicolous) :** বিভিন্ন প্রকার মাধ্যমে জন্মে। অর্থাৎ হাড়, চামড়া, লৌহ, কাচ, চুল, সিল্ক ইত্যাদির ওপর জন্মে। যেমন- *Lecanora dispersa*।

৬। **ফোলিকোলাস (folicolous) :** এরা ফার্ন বা সপুষ্পক উদ্ভিদের পাতার ওপর জন্মে। যেমন- ফার্নের পাতার ওপরে *Porina epiphylla* জন্মে।

(খ) গঠনগত শ্রেণিবিন্যাস : ইতোপূর্বে লাইকেনের মাত্র তিন প্রকার মৌলিক গঠনের কথা জানা যায়। সেগুলো হলো– ক্রাসটোজ, ফোলিয়োজ এবং ফ্রুটিকোজ। কিন্তু লাইকেনের ব্যাপক গবেষণার ফলে বিজ্ঞানী হক্সওয়ার্থ এবং হিল (Hawrsworth & Hill) ১৯৮৪ সালে লাইকেনকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন। যথা–

১। **ক্রাসটোজ লাইকেন (Crustose lichen) :** এরূপ লাইকেন চ্যাপ্টা, ক্ষুদ্রাকার এবং পোষক বস্তুর সাথে (গাছের বাকল, পুরাতন দেয়াল, পাথর, পর্বতগাত্র ইত্যাদি) নিবিড়ভাবে লেগে থাকে। যেমন- *Graphis scripta, Strigula, Cryptothecia rubrocinta, Diploicia canescens* ইত্যাদি।

চিত্র ৫.১৩ : (১) ক্রাসটোজ, (২) ফোলিয়োজ, (৩) ফ্রুটিকোজ লাইকেন

২। **ফোলিয়োজ লাইকেন (Foliose lichen) :** এ ধরনের লাইকেন দেখতে অনেকটা বিষমপৃষ্ঠ পাতার মতো। এদের কিনারা খাঁজকাটা ও আন্দোলিত। এর নিম্নতলে রাইজয়েড তুল্য রাইজাইন বের হয়। যেমন– *Flavoparmelia caperata, Parmotrema tinctorum, Xanthoria, Peltigera, Parmelia* ইত্যাদি।

৩। **ফ্রুটিকোজ লাইকেন (Fruticose lichen) :** এ ধরনের লাইকেন চ্যাপ্টা বা দণ্ডের মতো, অধিক শাখা-প্রশাখাযুক্ত এবং কেবল গোড়ার অংশ দিয়ে নির্ভরশীল বস্তুর গায়ে লেগে থাকে। এ ধরনের লাইকেন অনেক সময়ই ঝুলে থাকে, খাড়া হয়েও থাকতে পারে। যেমন- *Letharia columbiana, Usnea, Cladonia leporina* ইত্যাদি।

৪। **লেপ্রোজ লাইকেন (Leprose lichen) :** থ্যালাসের মধ্যে এটাই সবচেয়ে সরলতম প্রকৃতির। এক্ষেত্রে ছত্রাকের হাইফি শুধুমাত্র ১টি অথবা ক্ষুদ্র, একগুচ্ছ শৈবালের কোষকে আবৃত করে রাখে। তবে সুনির্দিষ্ট কোনো ছত্রাকের স্তর সম্পূর্ণ শৈবালের কোষগুলোকে ঢেকে রাখে না। যেমন- *Lapraria incana.*

৫। **সূত্রাকার লাইকেন (Filamentous lichen) :** কিছুসংখ্যক লাইকেনে শৈবাল অংশটি সূত্রাকার, পূর্ণ বিকশিত এবং প্রকট। এরা সামান্য কয়েকটি হাইফি দ্বারা আবৃত থাকে। যেমন- *Ephebe, Racodium*।

(গ) লাইকেন গঠনকারী ছত্রাকের ওপর ভিত্তি করে লাইকেন প্রধানত দু' প্রকার। যথা–

(i) অ্যাসকোলাইকেন (Ascolichen) : লাইকেন গঠনকারী ছত্রাক অ্যাসকোমাইসিটিস শ্রেণির হলে তাকে অ্যাসকোলাইকেন বলে। **অধিকাংশ লাইকেনই অ্যাসকোলাইকেন।**

(ii) ব্যাসিডিয়োলাইকেন (Basidiolichen) : লাইকেন গঠনকারী ছত্রাক ব্যাসিডিয়োমাইসিটিস শ্রেণির হলে তাকে ব্যাসিডিয়োলাইকেন বলে।

লাইকেনের অন্তর্গঠন : লাইকেনকে প্রস্থচ্ছেদ করলে একাধিক গঠনগত স্তর দৃষ্টিগোচর হয়। একটি ফোলিয়োজ লাইকেনের অন্তর্গঠন নিম্নরূপ:

(i) ঊর্ধ্ব কর্টেক্স (Upper cortex) : ঘন সন্নিবেশিত ছত্রাকীয় হাইফি দ্বারা এ স্তর গঠিত। এ স্তরে সাধারণত ফাঁক থাকে না, থাকলেও মিউসিলেজ দ্বারা পূর্ণ থাকে।

(ii) শৈবাল স্তর (Algal layers) : এ স্তরে ছত্রাকের হাইফির ফাঁকে ফাঁকে শৈবাল অবস্থিত। এ স্তরটি সংক্ষিপ্ত। একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির লাইকেনে শুধু এক ধরনের শৈবালই থাকে। পূর্বে এ স্তরকে গনিডিয়াল স্তর বলা হতো। কতগুলো প্রজাতিতে ছত্রাকের হাইফি হতে শৈবালের কোষে **হস্টোরিয়া** প্রবেশ করে।

(iii) মেডুলা (Medulla) : অত্যন্ত ফাঁকা ফাঁকাভাবে অবস্থিত ছত্রাকীয় হাইফি দ্বারা এ স্তর গঠিত। এ স্তর অপেক্ষাকৃত পুরু। হাইফি থ্যালাসের প্রান্তের দিকে বেশ পাতলা কিন্তু কেন্দ্রীয় অঞ্চলে ঘনভাবে সন্নিবিষ্ট। শৈবাল স্তরের নিচে এটি অবস্থিত। এ অঞ্চলের হাইফির শাখা-প্রশাখা বিভিন্ন দিকে বিস্তৃত।

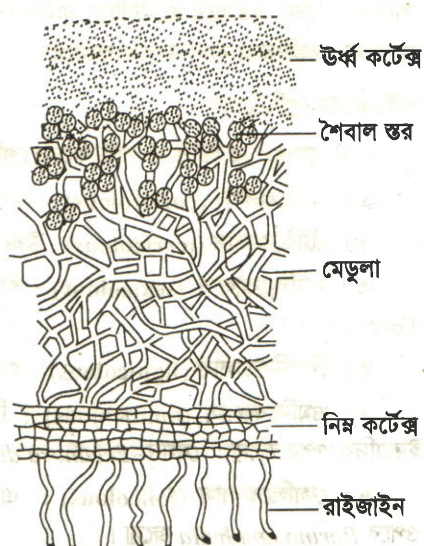

চিত্র ৫.১৪ : ফোলিয়োজ লাইকানের অন্তর্গঠন

(iv) নিম্ন কর্টেক্স (Lower cortex) : মেডুলার নিচে ঘন সন্নিবেশিত ছত্রাকীয় হাইফি দ্বারা এ স্তর গঠিত। এ স্তরের নিম্নপৃষ্ঠে বহু এককোষী **রাইজাইন** (রাইজয়েড তুল্য) থাকে যা লাইকেনকে নির্ভরশীল বস্তুর (বৃক্ষের বাকল, পাথর ইত্যাদি) সাথে আটকিয়ে রাখে এবং খাদ্যরস শোষণ করতে সাহায্য করে। রাইজাইন হলো দেহের নিম্নাংশে চুলের ন্যায় একটি অঙ্গ, যা মূলের মতো কাজ করে থাকে।

লাইকেনের জনন : লাইকেন অঙ্গজ, অযৌন এবং যৌন উপায়ে বংশবৃদ্ধি করে থাকে। থ্যালাসের **খণ্ডায়ন** (fragmentation) **ও ক্রমাগত মৃত্যু ও পচন** (progressive death & decay) প্রক্রিয়ায় লাইকেনের **অঙ্গজ জনন** ঘটে থাকে। **সোরেডিয়া** (Soredia, একবচনে-Soredium) ও **ইসিডিয়া** (Isidia, একবচনে- Isidium) এর পিকনিডিওস্পোরের মাধ্যমে **অযৌন জনন** হয়ে থাকে। **সোরেডিয়াম হলো** একটি শৈবালকে ছত্রাক দ্বারা চারদিক থেকে ঘিরে থাকা ক্ষুদ্রাকার দেহ যা বাতাসে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং উপযুক্ত পরিবেশে লাইকেন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

ইসিডিয়াম হলো লাইকেনের উর্ধ্ব কর্টেক্স দ্বারা আবৃত, ক্ষুদ্রাকার, সরল বা শাখান্বিত প্যাপিলির ন্যায় অযৌন রেণু যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও রূপান্তরিত হয়ে লাইকেন গঠন করে। **পিকনিডিয়া** (Pycnidia) হলো ফ্লাস্কের ন্যায় গঠনযুক্ত অংশ যারা মূলত লাইকেনের কিছু ছত্রাক দেহে (যেমন- *Cladonia* sp.) গঠিত হয়। পিকনিডিয়ার অভ্যন্তরে পিকনিডিওস্পোর গঠিত হয়। পিকনিডিওস্পোর অঙ্কুরোদগমের মাধ্যমে নতুন ছত্রাক অণুসূত্র গঠন করে। নতুন গঠিত ছত্রাক অণুসূত্র উপযুক্ত পরিবেশে শৈবালের সংস্পর্শে এলে নতুন লাইকেন গঠন করে।

লাইকেনে যৌন জনন মূলত ছত্রাক দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে। অ্যাস্কোলাইকেনে যৌন জনন সম্পাদিত হয় অ্যাস্কোকার্প (ascocarp) দিয়ে। এছাড়া প্লাজমোগ্যামির মাধ্যমেও লাইকেনের যৌন জনন সম্পন্ন হয়ে থাকে। প্লাজমোগ্যামি হলো, যে প্রক্রিয়ায় যৌন মিলনের পর ছত্রাকের দুটি জনন কোষের প্রোটোপ্লাজম মিলিত হয় কিন্তু নিউক্লিয়াস দুটি মিলিত হয় না। লাইকেনের পুংজননাঙ্গকে **স্পার্মাগোনিয়াম** এবং স্ত্রীজননাঙ্গকে **কার্পোগোনিয়াম** বলা হয়।

বাংলাদেশে লাইকেন শিক্ষা : বাংলাদেশে লাইকেন নিয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো গবেষণা হয়নি। এখানে কত প্রজাতির লাইকেন আছে তাও তালিকাভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। অতি ধীরগতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় বলে গবেষণাধর্মী *(experimental)* কোনো কাজ করতেও কেউ উৎসাহিত বোধ করেন না।

লাইকেনের গুরুত্ব (Importance of Lichen) : দৈনন্দিন জীবনে লাইকেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উপকারী দিক (Beneficial role) : নিচে লাইকেনের কয়েকটি উপকারী দিক উল্লেখ করা হলো—

(১) মরুজ ক্রমাগমন : মরু অঞ্চলে যেখানে অন্যকোনো জীব জন্মাতে পারে না তেমন জায়গায় লাইকেন জন্মায় এবং ধীরগতিতে মাটি গঠনে সহায়তা করে। সেখানে লাইকেনের মৃতদেহাবশেষ থেকে **হিউমাস** গঠিত হয়। এসব হিউমাস পাথরের সাথে মিশে মাটি গঠন করে। এরপর সেখানে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য জীব সম্প্রদায় জন্মাতে আরম্ভ করে। অর্থাৎ লাইকেন জেরোসিরি পর্যায়ের সূচনা করে।

(২) মানুষের খাদ্য হিসেবে : অধিকাংশ লাইকেনে **'লাইকেনিন'** (Lichenin) নামক একপ্রকার কার্বোহাইড্রেট থাকার কারণে কতক প্রজাতি মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। নরওয়ে, সুইডেন ও আইসল্যান্ডের অধিবাসীরা *Cetraria islandica* নামক লাইকেনটি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। ভারতের মাদ্রাজে *Parmelia*, মিসরে *Evernia* এবং চীন ও জাপানে *Endocarpon miniatum* (স্টোন মাশরুম) নামক লাইকেন মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

(৩) পশুর খাদ্য হিসেবে : তুন্দ্রা অঞ্চলের কিছু লাইকেন **Reindeer মস** (*Cladonia rangiferina*) নামে পরিচিত। এগুলো বলগা হরিণ ও গবাদি পশুর প্রিয় খাদ্য। কীট পতঙ্গের লার্ভার খাদ্য হিসেবেও লাইকেন ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

(৪) অ্যান্টিবায়োটিক হিসেবে : বিভিন্ন লাইকেন থেকে উৎপন্ন উসনিক অ্যাসিড গ্রাম পজেটিভ ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে অ্যান্টিবায়োটিকরূপে কার্যকর।

(৫) টিউমার (ক্যান্সার) রোগে : লাইকেন জাত Usno এবং Evosin নামক অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম টিউমার প্রতিরোধক, ব্যথা নিরাময়ক এবং ভাইরাস প্রতিরোধক। কিছু লাইকেন Lichenin ও Isolichenin সৃষ্টি করে। এরা টিউমার প্রতিরোধী।

(৬) হৃদরোগে : এনজাইনা নামক মারাত্মক হৃদরোগে *Rocella montaignei* লাইকেন থেকে উৎপন্ন Erythrin ব্যবহৃত হয়।

RMDAC

(৭) বিভিন্ন রোগে : জলাতঙ্কের ওষুধ হিসেবে *Peltigera,* হুপিং কফ রোগে *Cladonia* এবং যক্ষ্মার ওষুধ হিসেবে *Cetraria islandica* ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও জন্ডিস, ডায়রিয়া, অবিরাম জ্বর এবং নানাবিধ চর্মরোগেও লাইকেন জাত ওষুধ ব্যবহার করা হয়।

(৮) উদ্ভিদ রোগ নিরাময়ে : লাইকেন থেকে প্রাপ্ত সোডিয়াম উসনেট টমেটোর ক্যাঙ্কার রোগ এবং লিকানোরিক অ্যাসিড তামাকের মোজাইক রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়।

(৯) লিটমাস পেপার প্রস্তুতিতে : রসায়নাগারে লিটমাস পেপার অ্যাসিড বা ক্ষার নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়। *Rocella montaignei* ও *Lasallia* লাইকেন থেকে নির্গত রাসায়নিক উপাদানই লিটমাস পেপার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

(১০) সুগন্ধি ও প্রসাধনী সামগ্রী তৈরিতে : *Evernia, Ramalina* ইত্যাদি লাইকেন বিভিন্ন প্রসাধনী সামগ্রী ও সুগন্ধি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

(১১) রং ও ট্যানিন উৎপাদনে : *Cetraria, Lobaria* ইত্যাদি লাইকেন হতে ট্যানিন পাওয়া যায় যা চামড়া ট্যানিংয়ে ব্যবহৃত হয়। *Rocella montaignei* লাইকেন হতে এক ধরনের রং সংগ্রহ করা হয় যা উলেন ও সিল্ক জাতীয় কাপড় রং করতে ব্যবহৃত হয়।

(১২) উত্তেজক পদার্থ তৈরিতে : রাশিয়া, ফ্রান্স, সুইডেন ইত্যাদি দেশে ঈস্টের পরিবর্তে *Usnea, Ramalina* প্রভৃতি লাইকেন অ্যালকোহল, বিয়ার ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

অন্যান্য : লাইকেন নাইট্রোজেন সংবন্ধনে, রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদনে (লিকানোরিক অ্যাসিড, উসনিক অ্যাসিড), দূষণের সূচকরূপে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া কিছু লাইকেন থেকে ন্যাপথালিন, কর্পূর জেরানিয়ল, বর্নেঅল ইত্যাদি উদ্বায়ী দ্রব্য পাওয়া যায়।

অপকারী দিক (Harmful role) : লাইকেন বৃক্ষ, পুরাতন ইটের দেয়াল, মার্বেল পাথরের তৈরি সৌধ ইত্যাদির কিছুটা ক্ষতিসাধন করে থাকে। কতক লাইকেন বিষাক্ত। এসব লাইকেন ভক্ষণ করে অনেক গবাদি পশু এমনকি মানুষও অনেক সময় মারা যায়। *Cladonia, Usnea* গণের কোনো কোনো প্রজাতি তাদের আশ্রয়দাতা উদ্ভিদের বাকলসহ অন্যান্য অংশের ক্ষতিসাধন করে। মার্বেল পাথরের তৈরি মূল্যবান ভাস্কর্য, স্মৃতিসৌধ ইত্যাদিতে জন্মানো লাইকেন পাথরের ক্ষয়সাধন করে এবং সৌন্দর্য নষ্ট করে ফেলে।

Letharia vulpina নামক লাইকেনে বিষাক্ত পদার্থ থাকার কারণে ঐ লাইকেন নেকড়ে নিধনে ব্যবহার করা হয়। পুরাতন কাচের ওপর লাইকেন জন্মানোর ফলে কাচ অস্বচ্ছ হয়ে যায়। *Evernia, Usnea* প্রভৃতি লাইকেন মানুষের দেহে চর্মরোগ, এলার্জি ও হাঁপানি রোগ সৃষ্টি করে। *Usnea* জাতীয় লাইকেন এক গাছ থেকে অন্য গাছের মাথা পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। কোনো কারণে সেখানে **দাবানল** (forest fire) হলে ঐ লাইকেনের মাধ্যমে এক গাছ থেকে অন্য গাছে আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

আইসল্যান্ড মস (*Cetraria islandica*), স্টোন মাশরুম (*Endocarpon miniatum*), রক ফ্লাওয়ার (*Parmelia* sp.), রেনডিয়ার মস (*Cladonia rangiferina*) ইত্যাদি কতিপয় লাইকেনের বিশেষ নাম।

পরিবেশ দূষণের নির্দেশক হিসেবে লাইকেন : লাইকেন বাতাস বা বৃষ্টির পানি থেকে অতিদ্রুত তার প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করতে পারে। একইভাবে সালফার ডাই-অক্সাইড, হেভি মেটাল, রেডিও অ্যাকটিভ বস্তুও দ্রুত শোষণ করে থাকে। এসব দূষিত বস্তু শোষণের ফলে এদের মৃত্যু ঘটে। কাজেই বায়ু দূষণের একটি নির্দেশক (indicator) হিসেবে লাইকেনকে ধরা হয়। অর্থাৎ বায়ু দূষণ অঞ্চলে লাইকেন কম পাওয়া যাবে।

লাইকেনের পরিবেশীয় গুরুত্ব (Ecological significance of Lichen)

লাইকেন একটি অতি সাধারণ ও নিম্নশ্রেণির থ্যালয়েড উদ্ভিদ হলেও ভূমি ও বায়ুমণ্ডলে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা নিচে উল্লেখ করা হলো :

১। **পাথর থেকে মাটি তৈরি :** লাইকেন নির্গত CO_2 জলীয়বাষ্প বা বৃষ্টির পানি বা কুয়াশার সাথে মিশে যে কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি করে তা পাথর বা শিলাখণ্ডকে ক্ষয় করে ছোটো ছোটো মাটি কণায় পরিণত করে এবং মরুজ ক্রমাগমনের সূচনা করে যা এক সময় বনভূমি সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে।

২। **নাইট্রোজেন সংবন্ধন :** লাইকেনের দেহ গঠনকারী সায়ানোব্যাকটেরিয়া (*Nostoc, Anabaena*) শৈবাল বায়ুর মুক্ত N_2 গ্যাসকে উদ্ভিদের গ্রহণ উপযোগী NH_2, NO_2^-, NO_3 ইত্যাদিতে পরিণত করে।

৩। **মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা :** লাইকেন সৃষ্ট হিউমাস মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

৪। উন্মুক্ত পাহাড় ও গাছের বাকলে লাইকেন জন্মে তাদের দৃষ্টিনন্দন করে।

৫। পরিবেশ দূষণের ইন্ডিকেটর হিসেবে কাজ করে।

৬। গাছের গুড়ি, পুরাতন ইটের দেয়াল ও ছাদে লাইকেনের দীর্ঘ অবস্থানের ফলে আবাসস্থল ক্ষয় ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

দলগত কাজ : পরিবেশ থেকে বিভিন্ন ধরনের লাইকেন সংগ্রহ করে শনাক্ত করতে হবে। কোনটি কোন গাছের বাকলে পাওয়া গিয়েছে তা লিখতে হবে। সারাবছরই ঐ গাছে এটি থাকে কি-না তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করলে তা খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে। সবশেষে একটি প্রতিবেদন শিক্ষকের কাছে উপস্থাপন করতে হবে।

সার-সংক্ষেপ

শৈবাল : Algae (একবচনে Alga)-এর বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে শৈবাল। শৈবাল সালোকসংশ্লেষণকারী স্বভোজী, অভাস্কুলার, অপুষ্পক উদ্ভিদ। এদের জাইগোট স্ত্রীজননাঙ্গে থাকা অবস্থায় কখনো বহুকোষী ভ্রূণে পরিণত হয় না। শৈবাল এককোষী হতে পারে, বহুকোষীও হতে পারে। এককোষী শৈবাল এককভাবে বাস করতে পারে, আবার কলোনি করেও বাস করতে পারে। এরা মিঠা পানিতে, লবণাক্ত পানিতে, মাটিতে, এমনকি গাছের বাকল ও পাতায় বাস করতে পারে। ক্লোরোফিলযুক্ত এককোষী বা বহুকোষী সরল প্রকৃতির, অভাস্কুলার এবং সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদগোষ্ঠীকে **শৈবাল** বলে। অঙ্গজ, অযৌন ও যৌন–এসব প্রক্রিয়ায় এদের বংশবৃদ্ধি ঘটে। অধিকাংশ শৈবালই সবুজ, কতক শৈবাল বাদামি এবং কতক শৈবাল লাল বর্ণের। নীলাভ-সবুজ শৈবালকে বর্তমানে সায়ানোব্যাকটেরিয়া বলা হয়, কারণ এরা আদিকোষী; অন্য সব শৈবাল প্রকৃতকোষী। বাস্তুতন্ত্রের খাদ্যশৃঙ্খলে উৎপাদনকারী হিসেবে শৈবাল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ ও পশুর খাবার থেকে শুরু করে শৈবালের আরও অনেক গুরুত্ব আছে।

ছত্রাক : Fungi (একবচনে fungus)-এর বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে ছত্রাক। ছত্রাকে ক্লোরোফিল বা অন্যকোনো ফটোসিনথেটিক পিগমেন্ট না থাকায় এরা সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না। তাই ছত্রাক মৃতজীবী বা পরজীবী। বহুকোষী ছত্রাকের সূত্রকে **হাইফি** বলে। হাইফিগুলো একত্রিত হয়ে মাইসেলিয়াম গঠন করে। ছত্রাক প্রকৃতকোষী, অসবুজ, অভাস্কুলার এবং অপুষ্পক উদ্ভিদ। ক্লোরোফিলবিহীন এককোষী বা বহুকোষী সরল প্রকৃতির অভাস্কুলার, সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদগোষ্ঠীকে **ছত্রাক** বলে। অঙ্গজ, অযৌন এবং যৌন উপায়ে এদের জনন হয়ে থাকে। ফসলের অসংখ্য রোগের কারণ ছত্রাক। আবার মানুষের খাবার হিসেবে (যেমন- *Agaricus*), ওষুধ তৈরিতে, (যেমন- *Aspergillus*), শিল্পে (যেমন- Yeast) ছত্রাকের ব্যাপক ব্যবহার হয়।

লাইকেন : প্রকৃতিতে সহঅবস্থানের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লাইকেন। দুটি মিথোজীবী জীবের (শৈবাল ও ছত্রাক) সহবস্থানের ফলে লাইকেন সৃষ্টি হয়। ছত্রাক পরিবেশ থেকে পানি, খনিজ লবণ ইত্যাদি শোষণ করে শৈবালকে প্রদান করে, আর শৈবাল তা দিয়ে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রস্তুত করে। প্রস্তুতকৃত খাবার শৈবাল এবং ছত্রাক উভয়ই ভাগ করে গ্রহণ করে।

সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদ : উদ্ভিদজগতের এসব উদ্ভিদকে মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত করা যায় না। যেমন- শৈবাল।

এই অধ্যায়ে দক্ষতা অর্জন

১। শৈবাল হলো সুকেন্দ্রিক অভাস্কুলার, স্বভোজী, সেলুলোজনির্মিত কোষপ্রাচীরবিশিষ্ট, বন্ধ্যাকোষের আবরণীবিহীন জননাঙ্গধারী উদ্ভিদ।

২। সম্পূর্ণ ভাসমান ক্ষুদ্র শৈবালকে ফাইটোপ্লাঙ্কটন বলে।

৩। শৈবাল বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণা করাকে **ফাইকোলজি** হিসেবে অবহিত করা হয়। একে **অ্যালগোলজিও** বলা হয়।

৪। কোষে অসংখ্য নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট শৈবালকে **সিনোসাইটিক শৈবাল বলে;** যেমন- *Vaucheria*..

৫। বিশেষভাবে সজ্জিত নির্দিষ্ট সংখ্যক কোষের কলোনিকে বলা হয় **সিনোবিয়াম;** যেমন- *Volvox, Endorina.*

৬। পৃথিবীর মোট ফটোসিনথেসিস-এর **৬০ ভাগ** করে থাকে শৈবাল।

৭। সূত্রাকার নীলাভ সবুজ শৈবালের ট্রাইকোমের খণ্ডিত অংশকে **হরমোগোনিয়া** বলে।

৮। ফ্ল্যাজেলাবিহীন স্পোরকে **অ্যাপ্ল্যানোস্পোর** বলে।

৯। স্পোর সৃষ্টিকারী অঙ্গকে **স্পোরাঞ্জিয়াম** বলে।

১০। *Ulothrix* ক্লোরোফাইসি শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত শৈবাল।

১১। **পাইরিনয়েড** হলো প্রোটিনজাতীয় পদার্থের চকচকে দানাদার বস্তু।
১২। বাংলাদেশ থেকে আবিষ্কৃত একটি *Ulothrix* প্রজাতি হলো *U. simplex*।
১৩। জুস্পোর সৃষ্টিকারী অঙ্গ হলো **জুস্পোরাঞ্জিয়াম**।
১৪। স্ত্রী ও পুরুষ জননাঙ্গ দুটি পৃথক শৈবালদেহে সৃষ্টি হলে তাকে **হেটেরোথ্যালিক** শৈবাল বলে। *Ulothrix* একটি হেটেরোথ্যালিক শৈবাল।
১৫। *Ulothrix* শৈবাল হ্যাপ্লয়েড।
১৬। **ছত্রাক** হলো সুকেন্দ্রিক, অভাস্কুলার, অসবুজ, কাইটিন নির্মিত কোষপ্রাচীরবিশিষ্ট উদ্ভিদ।
১৭। ছত্রাক সম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণা হলো **মাইকোলজি** (ছত্রাকতত্ত্ব)।
১৮। উচ্চশ্রেণির ছত্রাকের মাইসেলিয়াম শক্ত রশির মতো যে গঠন সৃষ্টি করে তাকে **রাইজোমর্ফ** বলে।
১৯। উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদের মূল বা মূলরোমের অভ্যন্তর বা চারপাশ বেষ্টনকারী ছত্রাক জালিকাকে **মাইকোরাইজাল** ছত্রাক বলে।
২০। উদ্ভিদ মূল ও সহযোগী ছত্রাকের মধ্যকার মিথোজীবীয় ঘনিষ্ঠতাকে **মাইকোরাইজা** বলে।
২১। ছত্রাকের খাদ্য গ্রহণ **শোষণ** প্রকৃতির। খাদ্য পরিপাক হয় দেহের বাইরে এবং **পরিপাককৃত** খাদ্য হাইফি শোষণ করে দেহাভ্যন্তরে নেয়।
২২। পোষক দেহের অভ্যন্তরে প্রতিটি পরজীবী ছত্রকের হাইফিকে **হস্টোরিয়া** বলে।
২৩। অসংখ্য শাখা প্রশাখাবিশিষ্ট সূত্রাকার হাইফি দ্বারা গঠিত ছত্রাক দেহকে **মাইসেলিয়াম** বলে।
২৪। ছত্রাক কোষ প্রাচীরের **কাইটিন** হলো এক প্রকার **পলিস্যাকারাইড**।
২৫। যে ছত্রাকের সমস্ত দেহটিই জনন কাজে ব্যবহৃত হয় সে ছত্রাককে বলা হয় **হলোকার্পিক** ছত্রাক; যেমন- *Synchytrium.*
২৬। যে ছত্রাকের দেহের অংশবিশেষ জননকাজে ব্যবহৃত হয় সে ছত্রাককে বলা হয় **ইউকার্পিক** ছত্রাক; যেমন- *Saprolegnia*।
২৭। আলুর **লেটব্লাইট** রোগ হয় *Phytophthora infestans* নামক ছত্রাক দ্বারা। ১৮৪০ দশকের **আইরিশ দুর্ভিক্ষ** হয়েছিল আইরিশ আলুর মরকের কারণে যা *Phytophthora infestans* দিয়ে হয়েছিল।
২৮। মানুষের দাদরোগ হয় *Trichophyton* নামক ছত্রাক দ্বারা, *Microsporum* দিয়েও দাদরোগ হতে পারে।
২৯। শৈবাল ও ছত্রাকের সিমবায়োটিক অবস্থানে সৃষ্ট বিশেষ ধরনের উদ্ভিদ হলো **লাইকেন**।
৩০। লাইকেনের শৈবাল অংশকে **ফটোবায়োন্ট** বলে, আর ছত্রাক অংশকে **মাইকোবায়োন্ট** বলে।
৩১। **সোরেডিয়াম** (বহুবচন-সোরেডিয়া) হলো লাইকেনের অযৌন জনন স্পোর যা শৈবাল অংশকে ছত্রাক অংশ দ্বারা ঘিরে থাকা ক্ষুদ্রাকার দেহ। সোরেডিয়াম বাতাসে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং উপযুক্ত পরিবেশে লাইকেন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।
৩২। **ইসিডিয়াম** (বহুবচন ইসিডিয়া) হলো লাইকেনের উর্ধ্ব কর্টেক্স দ্বারা আবৃত ক্ষুদ্রাকার অযৌন রেণু।
৩৩। লাইকেনের পুংজননাঙ্গকে **স্পার্মাগোনিয়াম** এবং স্ত্রীজননাঙ্গকে **কার্পোগোনিয়াম** বলে।
৩৪। লাইকেনের নিম্নত্বক থেকে উদগত এককোষী রোমকে **রাইজাইন** বলে।
৩৫। লাইকেনের মৌলিক গঠন প্রধানত তিন প্রকার। যথা– **ক্রাসটোজ, ফোলিয়োজ** এবং **ফ্রুটিকোজ**।
৩৬। অনেক লাইকেনে **লাইকেনিন** নামক কার্বোহাইড্রেট থাকে।
৩৭। রেইনডিয়ার মস প্রকৃতপক্ষে মস নয়; এক প্রকার লাইকেন, নাম *Cladonia rangiferina*।
৩৮। লাইকেন **বায়ু দূষণের নির্দেশক** (indicator), কারণ দূষিত বায়ু অঞ্চলে লাইকেনের উপস্থিতি কম হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ)

১। ফ্ল্যাজেলাযুক্ত স্পোরকে বলে—
(ক) জুস্পোর (খ) অ্যাপ্লানোস্পোর (গ) হিপনোস্পোর (ঘ) অটোস্পোর

২। *Agaricus* এর বৈশিষ্ট্য হলো—
(i) এদের দেহ মাইসেলিয়াম ও ফ্রুটবডি নিয়ে গঠিত
(ii) কনিডিয়োস্পোর ঝাঁটার ন্যায়
(iii) স্টাইপের মাথায় একটি চক্রাকার অ্যানুলাস থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকের চিত্রটি দেখে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

৩। উদ্দীপকের উদ্ভিদের রোগের আরো লক্ষণ হলো—
(i) গাছ পচে গিয়ে বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গন্ধ বের হয়
(ii) ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ডের বহিঃত্বক পচে যায়
(iii) কাণ্ডে ছোটো ছোটো লাল গোটা হয়।
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। উদ্দীপকের উদ্ভিদটির রোগের সাথে নিম্নের কোন রোগের সর্বাধিক মিল আছে?
(ক) মরিচা রোগ (খ) আলগা রোগ (গ) ফ্লাগ রোগ (ঘ) বিলম্বিত ধ্বসা রোগ

বহুনির্বাচনি প্রশ্নাবলির উত্তরমালা :

১। (ক)	২। (খ)	৩। (খ)	৪। (ঘ)

সৃজনশীল প্রশ্নের (CQ) নমুনা

উদ্দীপকটি পড়ো এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

১। P ও Q দুটি ভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ এক সঙ্গে বসবাস করে, একে অপরের উপকার করে এবং একটি নতুন স্বয়ংসম্পূর্ণ থ্যালয়েড উদ্ভিদ তৈরি করে।
(ক) আংটি আকৃতির ক্লোরোপ্লাস্ট কোথায় পাওয়া যায়?
(খ) রাইজোমরফ কী এবং কোথায় পাওয়া যায়?
(গ) উদ্দীপকের P ও Q উদ্ভিদের সাধারণ নাম ও বৈশিষ্ট্য লেখ।
(ঘ) উদ্দীপকের দুটি উদ্ভিদ মিলে কীভাবে একটি উদ্ভিদ তৈরি করে এবং তাদের নির্ভরশীলতা আলোচনা করো।

২। আলু চাষের জন্য বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ জেলা বিখ্যাত। ১৯৯৯ সালে এখানকার আলু চাষিরা দেখলো যে, তাদের ক্ষেতের আলু গাছগুলোর পাতায় প্রথমে হালকা বাদামি বর্ণের মতো (ক্ষত) দাগ। এ দাগ পরবর্তীতে আলুতেও দেখা যায়।
(ক) হোল্ডফাস্ট (Holdfast) কী?
(খ) ফ্রুটিকোজ লাইকেন (Fruticose Lichen) বলতে কী বুঝ?
(গ) উক্ত এলাকার আক্রান্ত গাছগুলোর লক্ষণ বর্ণনা করো।
(ঘ) উক্ত চাষিদের এ অবস্থা হতে উত্তরণের জন্য কী কী পন্থা অবলম্বন করা উচিত বলে তুমি মনে করো–মতামত দাও।

৩। পাশের চিত্রটি লক্ষ্য করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

(ক) Haustorium কী?
(খ) *Agaricus* এর উপকারিতা লেখ।
(গ) চিত্রে দেখানো উদ্ভিদের দৈহিক গঠন বর্ণনা করো।
(ঘ) চিত্রে প্রদর্শিত জীবে কী জনুঃক্রম সম্ভব—ব্যাখ্যা করো।

দশম অধ্যায়

উদ্ভিদ প্রজনন

PLANT REPRODUCTION

প্রধান শব্দসমূহ :
প্রজনন, নিষেক, পার্থেনোজেনেসিস, সংকরায়ন।

মাধ্যমিক শ্রেণিতে তোমরা জীবের প্রজনন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা লাভ করেছো, বিশেষ করে পুষ্পক উদ্ভিদের প্রজনন অঙ্গ, ফুলের গঠন, পরাগায়ন, গ্যামিট সৃষ্টি, নিষেক এবং ফল ও বীজ উৎপাদন বিষয়ে জেনেছো। এ অধ্যায়ে বিষয়টি আর একটু বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায় পাঠশেষে শিক্ষার্থীরা—

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে শিক্ষার্থীরা যা যা শিখবে—	পাঠ পরিকল্পনা	
❖ বিভিন্ন প্রকার প্রজনন প্রক্রিয়া।	পাঠ ১	যৌন প্রজনন
❖ বিভিন্ন প্রকার প্রজনন প্রক্রিয়ার মধ্যে তুলনা।	পাঠ ২	অযৌন প্রজনন
❖ কৃত্রিম প্রজননের ধারণা।	পাঠ ৩	উদ্ভিদের কৃত্রিম অঙ্গজ জনন
❖ কৃত্রিম প্রজননের উপায় হিসেবে উদ্ভিদের সংকরায়ন।	পাঠ ৪	উদ্ভিদ সংকরায়ন
❖ কৃত্রিম প্রজননের গুরুত্ব।		

প্রজনন জীবের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। জড় বস্তুর প্রজনন ক্ষমতা নেই। প্রতিটি জীবেরই তার অনুরূপ বংশধর সৃষ্টির প্রাকৃতিক ব্যবস্থা আছে। কাঁঠালের বীজ থেকে কাঁঠাল চারা, আমের বীজ থেকে আম চারা হয় যা বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে পরিপূর্ণ কাঁঠাল গাছ ও আম গাছে পরিণত হয়। একই ভাবে কলা গাছের গোড়া থেকে কলার চারা (সাকার), বাঁশ গাছের গোড়া থেকে বাঁশের চারা (সাকার) যা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে পূর্ণাঙ্গ কলা গাছ ও বাঁশ গাছে পরিণত হয়। শিমুল, সজিনা, মাদার, জীয়ল ইত্যাদি গাছের ডাল কেটে মাটিতে লাগালে সেই ডাল সজীব হয়ে পরিপূর্ণ গাছে পরিণত হয়। পাথরকুচি পাতা মাটিতে ফেলে রাখলে তার কিনার থেকে নতুন পাথরকুচি চারা সৃষ্টি হয়। **মাতৃ উদ্ভিদ থেকে নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টির প্রক্রিয়াই উদ্ভিদের প্রজনন প্রক্রিয়া।** যে **শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় জীব তার অনুরূপ অপত্য বংশধর সৃষ্টি করে সেই প্রক্রিয়াকে প্রজনন বলা হয়।** এ অধ্যায়ে উদ্ভিদের প্রজনন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ভ্রূণ সৃষ্টি, তার বিকাশ ও প্রকাশই উদ্ভিদের যৌন প্রজননের মূল উদ্দেশ্য। একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভ্রূণ সৃষ্টি হয়। উদ্ভিদের ভ্রূণ সৃষ্টি ও বিকাশের বৈজ্ঞানিক আলোচনাই **উদ্ভিদ ভ্রূণবিজ্ঞান** বা Plant Embryology। Embryo-এর বাংলা হলো ভ্রূণ।

প্রজননের প্রকারভেদ : উদ্ভিদে বিভিন্ন উপায়ে প্রজনন হয়ে থাকে। তবে বিভিন্ন উপায়গুলোকে মূলত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ১। **যৌন প্রজনন** এবং ২। **অযৌন প্রজনন**। এছাড়া কোনো কোনো উদ্ভিদে অন্য এক ধরনের প্রজনন দেখা যায় যা **পার্থেনোজেনেসিস** বা **অপুংজনি** নামে পরিচিত।

আবৃতবীজী উদ্ভিদে যৌন প্রজনন (Sexual Reproduction of Angiosperm)

আবৃতবীজী উদ্ভিদে ডিম্বাণু সৃষ্টি হয় ডিম্বকে, ডিম্বক সৃষ্টি হয় ফুলের স্ত্রীকেশরের গর্ভাশয়ে। শুক্রাণু সৃষ্টি হয় পরাগরেণুতে, পরাগরেণু সৃষ্টি হয় ফুলের পুংকেশরের পরাগধানীতে। কাজেই ফুলই আবৃতবীজী উদ্ভিদে জননাঙ্গ ধারণ করে। **ফুল হলো উদ্ভিদের বংশবিস্তারের (প্রজননের) জন্য বিশেষভাবে রূপান্তরিত বিটপ (shoot)।**

১। যৌন প্রজনন (Sexual reproduction) : দু'টি ভিন্ন প্রকৃতির গ্যামিটের (পুং এবং স্ত্রী গ্যামিট) মিলনের মাধ্যমে যে প্রজনন প্রক্রিয়ার সূচনা হয় তাই যৌন প্রজনন। যৌন প্রজননের মাধ্যমে সবীজী উদ্ভিদে বীজের সৃষ্টি হয়, তাই বীজ দ্বারা বংশবৃদ্ধি প্রক্রিয়াই যৌন প্রজনন। আবৃতবীজী উদ্ভিদের যৌন প্রজনন উগ্যামাস ধরনের।

রেণুস্থলী বা পরাগরেণুর পরিস্ফুটন (Development of Microsporangia) : ফুলের তৃতীয় স্তবক হলো পুংজনন স্তবক। এক বা একাধিক পুংকেশর নিয়ে এ স্তবক গঠিত। প্রতিটি পুংকেশর নিচে দণ্ডাকার **পুংদণ্ড** (filament) এবং মাথায় স্ফীত **পরাগধানী** (anther) নিয়ে গঠিত। পরাগধানীর দুটি খণ্ডের মাঝখানে একটি **যোজনী** (connective) থাকে।

পরিণত পরাগধানী (anther) অনেকটা চারকোণাবিশিষ্ট হয়। প্রতি কোণে ভেতরের দিকে কিছু কোষ আশপাশের কোষ হতে আকারে বড়ো হয়। এদের ঘন সাইটোপ্লাজম এবং বড়ো নিউক্লিয়াস থাকে। এসব কোষকে আর্কিস্পোরিয়্যাল কোষ (archesporial cell) বলা হয়। এ কোষ প্রজাতিভেদে সংখ্যায় এক থেকে একাধিক থাকতে পারে। **আর্কিস্পোরিয়্যাল** কোষ বিভাজিত হয়ে পরিধির দিকে **দেয়ালকোষ** এবং কেন্দ্রের দিকে **প্রাথমিক জননকোষে** (primary sporogenous cell) পরিণত হয়। দেয়ালকোষ হতে পরে ৩–৫ স্তরবিশিষ্ট প্রাচীর গঠিত হয়। পরাগধানীর প্রাচীর ঘেরা এ অংশকে **পরাগথলি** (pollen sac) বলে। প্রাচীরের সবচেয়ে ভেতরের স্তর হলো **ট্যাপেটাম**।

পরাগধানীর আর্কিস্পোরিয়্যাল কোষ (2n) → দেয়াল কোষ (2n) ⟶ প্রাচীর গঠন

পরাগধানীর আর্কিস্পোরিয়্যাল কোষ (2n) → প্রাথমিক জনন কোষ (2n) ⟶ পরাগমাতৃ কোষ (2n) —মায়োসিস⟶ পরাগরেণু (n) (৪টি)

প্রাথমিক জননকোষ পরাগমাতৃকোষ হিসেবে কাজ করতে পারে অথবা বিভাজিত হয়ে অনেকগুলো পরাগমাতৃকোষে পরিণত হতে পারে। **পরাগমাতৃকোষে** তখন মায়োসিস (meiosis) বিভাজন হয়, ফলে প্রতিটি ডিপ্লয়েড (2n) পরাগমাতৃকোষ হতে চারটি হ্যাপ্লয়েড (n) পরাগরেণুর সৃষ্টি হয়। পরাগরেণু বিভিন্ন বর্ণের হতে পারে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণত হলুদ বর্ণের হয়। **ট্যাপেটাম** (tapetum) বিগলিত হয়ে পরিস্ফুটিত পরাগরেণুর পুষ্টি সাধন করে। পরাগমাতৃকোষ হতে সৃষ্ট চারটি পরাগরেণু বিভিন্ন প্রজাতিতে বিভিন্নভাবে সাজানো থাকে, চারটি পরাগরেণু একসাথে হালকাভাবে লাগানো অবস্থায় থাকে যাকে **পরাগ চতুষ্টয়** বা **পোলেন টেট্রাড** (Pollen tetrad) বলে। তবে পরিণত অবস্থায় পরাগরেণুগুলো পরস্পর আলাদা হয়ে যায়। Orchidaceae, Asclepiadaceae এসব গোত্রের উদ্ভিদের পরাগরেণু পৃথক না হয়ে একসাথে থাকে। একসাথে থাকা পরাগরেণুগুলোর এ বিশেষ গঠনকে **পলিনিয়াম** (pollinium) বলে।

পরাগরেণুর গঠন : পরাগরেণু সাধারণত গোলাকার, ডিম্বাকার ও ত্রিভুজাকার হয় এবং এদের ব্যাস ১০ থেকে ২০০ μm পর্যন্ত হয়ে থাকে। প্রতিটি পরাগরেণু এককোষী, এক নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট এবং হ্যাপ্লয়েড। প্রতিটি পরাগরেণুর দুটি ত্বক থাকে। বাইরের ত্বকটি কিউটিনযুক্ত, পুরু ও শক্ত। এটি বহিঃত্বক বা **এক্সাইন** (axine) নামে পরিচিত। এক্সাইন বিভিন্নভাবে অর্নামেন্টেড থাকে। এক্সাইন-এ বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান থাকে, প্রধান উপাদান হলো **স্পোরোপোলেনিন**। ভেতরের ত্বকটি

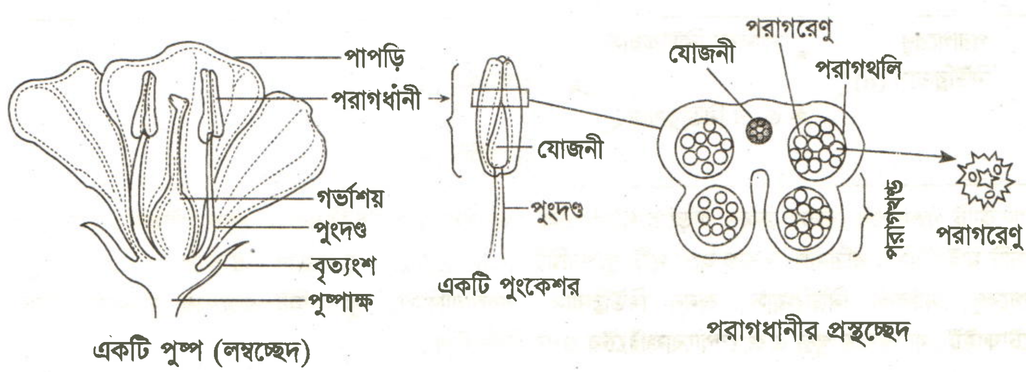

চিত্র ১০.১ : একটি পুষ্প (লম্বচ্ছেদ), একটি পুংকেশর, পরাগধানীর প্রস্থচ্ছেদ এবং একটি পরাগরেণু।

বেশ পাতলা এবং সেলুলোজ নির্মিত। এর নাম অন্তঃত্বক বা **ইনটাইন** (intine)। এক্সাইন (বহিঃত্বক) স্থানে স্থানে অত্যন্ত পাতলা থাকে, পাতলা ছিদ্রের ন্যায় অংশকে **জনন ছিদ্র, রেণুরন্ধ্র বা জার্মপোর** (germpore) বলে (চিত্র-১০.২)। একটি

RMDAC

পরাগরেণুতে সাধারণত একাধিক জার্মপোর (২০টি পর্যন্ত) থাকে। পরাগরেণুর সাইটোপ্লাজম ঘন থাকে এবং প্রথম পর্যায়ে নিউক্লিয়াসটি মাঝখানে থাকে। পরিণত অবস্থায় কোষগহ্বর সৃষ্টির ফলে নিউক্লিয়াসটি এক দিকে সরে আসে।

পুংগ্যামিটোফাইটের বিকাশ বা পরিস্ফুটন (Development of male gametophyte) ও গঠন : **পরাগরেণু(n) হলো পুংগ্যামিটোফাইটের প্রথম কোষ।** পরাগরেণুর নিউক্লিয়াসটি বিভাজিত হয়ে দুটি অসম নিউক্লিয়াস গঠন করে। বড়োটিকে

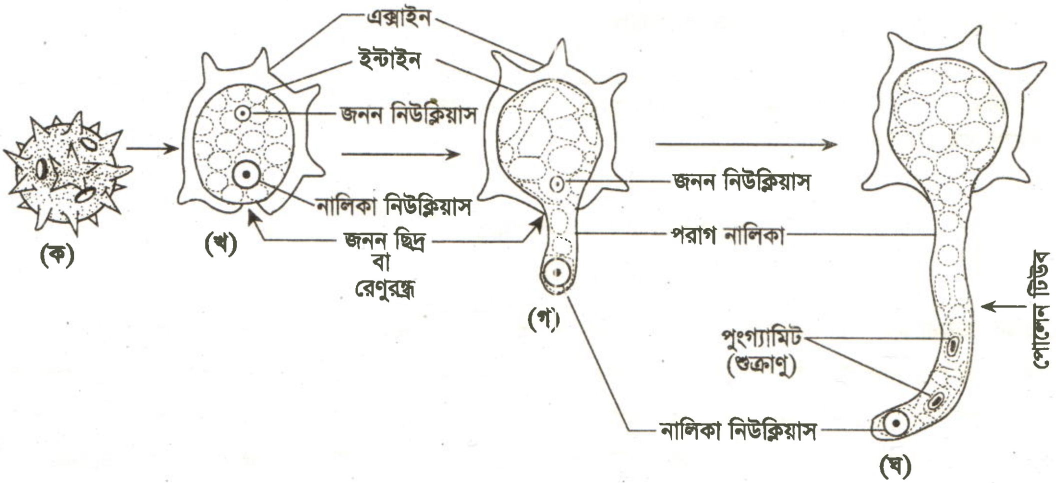

চিত্র ১০.২: (ক) পরাগরেণু, (খ–গ) পুংগ্যামিটোফাইট সৃষ্টির বিভিন্ন ধাপ এবং (ঘ) পুংগ্যামিটোফাইট।

বলা হয় **নালিকা নিউক্লিয়াস** (tube nucleus) এবং ছোটোটিকে বলা হয় **জনন নিউক্লিয়াস** (generative nucleus)। পরাগধানীর প্রাচীর ফেটে গেলে সাধারণত **এ দ্বি-নিউক্লিয়াস অবস্থায় পরাগরেণু** বের হয়ে আসে এবং **পরাগায়ন** (Pollination) সংঘটিত হয়। পরাগরেণুর পরবর্তী ধাপসমূহ পরাগ নালিকার মধ্যে ঘটে থাকে। উদ্ভিদে পরাগায়নের কারণে কোনো তরল পদার্থ (পানি) ছাড়াই নিষিক্তকরণ (fertilization) সম্ভব হয়। পরাগায়নের মাধ্যমে পরাগরেণু স্ত্রীকেশরের গর্ভমুণ্ডে পতিত হয় এবং অঙ্কুরিত হয় অর্থাৎ ইনটাইন বৃদ্ধি পেয়ে জার্মপোর (জননছিদ্র) দিয়ে নালিকার আকারে বাড়তে থাকে। এ নালিকাকে **পোলেন টিউব** (pollen tube) বা **পরাগনালিকা** বলে। পরাগনালিকার ভেতরে নালিকা নিউক্লিয়াস এবং পরে জনন নিউক্লিয়াস প্রবেশ

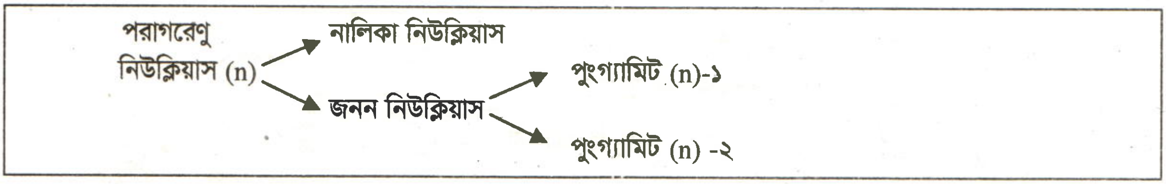

করে। নালিকাটি গর্ভদণ্ডের ভেতর ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং গর্ভাশয়ের ভেতরে ডিম্বকরন্ধ্র পর্যন্ত পৌঁছায়। ইতোমধ্যে জনন নিউক্লিয়াসটি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে দুটি **পুংগ্যামিট** (male gamete) বা **শুক্রাণু** সৃষ্টি করে।

পরাগরেণু, নালিকা নিউক্লিয়াস, জনন নিউক্লিয়াস, পরাগনালিকা, পুংগ্যামিট–এগুলোর সমন্বয়ে গঠিত হলো পুংগ্যামিটোফাইট, যা অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং স্পোরোফাইটের ওপর নির্ভরশীল।

ডিম্বকের পরিস্ফুটন (Development of ovule) : ডিম্বক হলো ডিম্বাশয়ের অভ্যন্তরস্থ একটি অংশ যা মাতৃজননকোষ সৃষ্টি করে এবং নিষেকের পর বীজে পরিণত হয়। ডিম্বক (ovule) সৃষ্টি হয় গর্ভাশয়ের ভেতরে অমরা (placenta) হতে। প্রথমে অমরাতে একটি ছোটো স্ফীত অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত হয়। স্ফীত অঞ্চলটি ক্রমে ডিম্বকে পরিণত হয়। প্রথম পর্যায়ে

ডিম্বকের টিস্যুকে মূলত দুটি ভাগে চিহ্নিত করা যায়– চারপাশের **আবরণ** টিস্যু এবং মাঝের **নিউসেলাস** (nucellus) টিস্যু। পরবর্তী পর্যায়ে বাইরের আবরণটির নিচে আর একটি আবরণ তৈরি হয়। বাইরের আবরণটি **বহিঃত্বক** এবং ভেতরেরটি **অন্তঃত্বক** হিসেবে পরিচিত। ডিম্বকের অগ্রভাগে নিউসেলাসের একটু অংশ অনাবৃত থাকে, কারণ ত্বক এ অংশকে আবৃত করে না। এটি একটি ছিদ্রপথ বিশেষ, যাকে **মাইক্রোপাইল** (micropile) বা **ডিম্বকরন্ধ্র বলা** হয়। ডিম্বকরন্ধ্রের কাছাকাছি নিউসেলাস টিস্যুতে একটি কোষ আকারে বড়ো হয়। এর নিউক্লিয়াসটিও আকারে অপেক্ষাকৃত বড়ো থাকে এবং কোষটি ঘন সাইটোপ্লাজমে পূর্ণ থাকে। এ কোষকে প্রাইমারি আর্কিস্পোরিয়্যাল কোষ (primary archesporial cell) বলে। **আর্কিস্পোরিয়্যাল** কোষটি বিভক্ত হয়ে একটি **দেয়ালকোষ** এবং একটি **প্রাথমিক জননকোষ** (primary sporogenous cell) সৃষ্টি করতে পারে অথবা সরাসরি **স্ত্রীরেণু মাতৃকোষ** (megaspore mother cell) হিসেবে কাজ করে।

ডিম্বকের
আর্কিস্পোরিয়্যাল কোষ (2n) → দেয়াল কোষ (2n)
→ প্রাথমিক জননকোষ (2n) → স্ত্রীরেণু মাতৃকোষ(2n) —মায়োসিস→ স্ত্রীরেণু (n) ৪টি (১টি কর্মক্ষম)

ডিপ্লয়েড স্ত্রীরেণু মাতৃকোষটি মায়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত **হয়ে চারটি হ্যাপ্লয়েড স্ত্রীরেণু** (megaspore) তৈরি করে। চারটি স্ত্রীরেণুর মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনটি নষ্ট হয়ে যায় এবং একটি (নিচেরটি) কার্যকর হয়।

ডিম্বকের গঠন : একটি ডিম্বক (megasporangium = ovule) নিম্নলিখিত অংশ নিয়ে গঠিত:

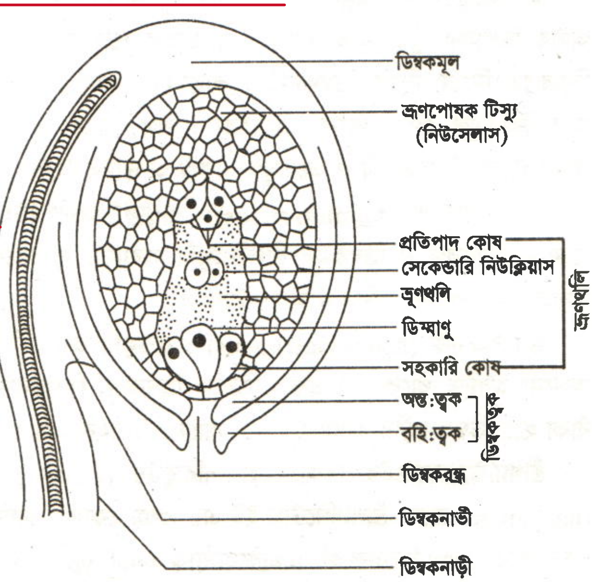

চিত্র ১০.৩ : ডিম্বকের গঠন (নিম্নমুখী বা অধোমুখী ডিম্বকের লম্বচ্ছেদ)।

১। **ডিম্বকনাড়ী (Funiculus)** : ডিম্বকের বোঁটার ন্যায় অংশকে ডিম্বকনাড়ী বলা হয়। এ বোঁটার সাহায্যে ডিম্বক অমরার সাথে সংযুক্ত থাকে। কোনো কোনো প্রজাতিতে ডিম্বকনাড়ী ডিম্বকত্বকের সাথে আংশিকভাবে যুক্ত থেকে শিরার মতো গঠন করে। এ যুক্ত অংশকে **র‍্যাফি** (raphe) বলে।

২। **ডিম্বকনাভী (Hilum)** : ডিম্বকের যে অংশের সাথে ডিম্বকনাড়ী সংযুক্ত থাকে তাকে ডিম্বকনাভী বলে।

৩। **নিউসেলাস (Nucellus)** বা **ভ্রূণপোষক টিস্যু:** ত্বক দিয়ে ঘেরা প্রধান টিস্যুই হলো নিউসেলাস।

৪। **ডিম্বকত্বক (Integument)** : নিউসেলাসের বাইরের আবরণীকেই ডিম্বকত্বক বলা হয়। সাধারণত এটি দুস্তরবিশিষ্ট।

৫। **ডিম্বকরন্ধ্র (Micropyle)** : ডিম্বকের অগ্রপ্রান্তে ত্বকের ছিদ্র অংশই ডিম্বকরন্ধ্র বা মাইক্রোপাইল।

৬। **ডিম্বকমূল (Chalaza)** : ডিম্বকের গোড়ার অংশ, যেখান থেকে ত্বকের সূচনা হয়, তাকে ডিম্বকমূল বলে।

৭। **ভ্রূণথলি (Embryo sac)** : নিউসেলাসের মধ্যে অবস্থিত থলির ন্যায় অংশকে ভ্রূণথলি বলে। ভ্রূণথলি নিম্নবর্ণিত তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত।

(ক) **গর্ভযন্ত্র (Egg-apparatus) :** ডিম্বকরন্ধ্রের সন্নিকটে তিনটি কোষ দিয়ে গঠিত ভ্রূণথলির অংশকে গর্ভযন্ত্র বলে। গর্ভযন্ত্রের তিনটি কোষের মধ্যে ভেতরের দিকের সবচেয়ে বড়ো কোষটিকে **ডিম্বাণু** এবং বাইরের দিকের ছোটো কোষ দুটিকে সহকারী কোষ (Synergid) বলে।

(খ) **প্রতিপাদ কোষ (Antipodal cell) :** এরা ডিম্বকমূলের দিকে অবস্থিত ভ্রূণথলির তিনটি বিশেষ কোষ।

(গ) **সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস (Secondary nucleus) :** দুমেরু থেকে আগত এবং ভ্রূণথলির কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত দুটি নিউক্লিয়াসকে **মেরু নিউক্লিয়াস (Polar nucleus)** বলে। নিউক্লিয়াস দুটি মিলিত হয়ে যে একটি ডিপ্লয়েড (2n) নিউক্লিয়াস গঠন করে তার নাম সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস।

বিভিন্ন প্রকার ডিম্বক : ডিম্বকরন্ধ্র, ডিম্বাকনাড়ী, ডিম্বকমূল ইত্যাদি অংশের পারস্পরিক অবস্থান অনুযায়ী ডিম্বক নিম্নলিখিত প্রকার হয়ে থাকে।

১। ঊর্ধ্বমুখী (Orthotropous or Atropous) : ঊর্ধ্বমুখী অর্থাৎ ডিম্বকের মুখ ওপরে থাকে। এ প্রকার ডিম্বকে ডিম্বকনাড়ী, ডিম্বমূল ও ডিম্বকরন্ধ্র একই সরল রেখায় খাড়াভাবে অবস্থিত থাকে। ডিম্বকরন্ধ্র শীর্ষে এবং ডিম্বকমূল গোড়ায় অবস্থান করে। উদাহরণ : বিষকাটালী (পানি মরিচ), গোলমরিচ, পান ইত্যাদি।

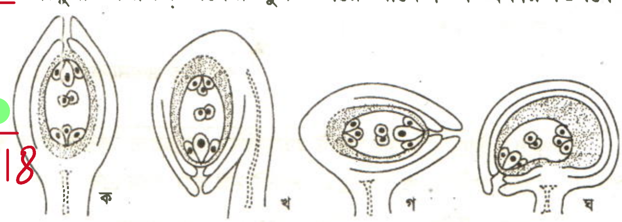

চিত্র ১০.৪ : বিভিন্ন প্রকার ডিম্বকের গঠন। (ক) ঊর্ধ্বমুখী; (খ) অধোমুখী, (গ) পার্শ্বমুখী; (ঘ) বক্রমুখী।

২। অধোমুখী বা নিম্নমুখী (Anatropous) : অধোমুখী অর্থাৎ ডিম্বকের মুখ নিচে থাকে। এ প্রকার ডিম্বকে ডিম্বকরন্ধ্র নিচের দিকে ডিম্বকনাড়ীর কাছাকাছি থাকে, আর ডিম্বকমূল ওপরে থাকে। উদাহরণ : শিম, রেড়ি, ছোলা ইত্যাদি। ঊর্ধ্বমুখী ও অধোমুখী একটি অপরটির উল্টো।

৩। পার্শ্বমুখী (Amphitropous) : পার্শ্বমুখী অর্থাৎ ডিম্বকের মুখ ওপরে বা নিচে নয়, এক পাশে থাকে। এ প্রকার ডিম্বকে ডিম্বকরন্ধ্র ও ডিম্বকমূল বিপরীতমুখী অবস্থানে দু' পাশে থাকে এবং ডিম্বকনাড়ীর সাথে সমকোণে অবস্থান করে। উদাহরণ-ক্ষুদিপানা, পপি (আফিম) ইত্যাদি।

৪। বক্রমুখী (Campylotropous) : বক্রমুখী অর্থাৎ ডিম্বকের মুখ পার্শ্বমুখীর চেয়ে কিছুটা বেঁকে নিচের দিকে মুখ করানো অবস্থায় থাকে। এ প্রকার ডিম্বকে ডিম্বকমূল ডিম্বকনাড়ীর সাথে সমকোণে অবস্থিত কিন্তু ডিম্বকরন্ধ্র অঞ্চলটি একটু বাঁকা হয়ে ডিম্বকনাড়ীর কাছাকাছি চলে আসে। উদাহরণ- সরিষা, কালকাসুন্দা।

স্ত্রীগ্যামিটোফাইটের বিকাশ বা পরিস্ফুটন (Development of female gametophyte) ও গঠন : স্ত্রীরেণু (megaspore) **হলো স্ত্রীগ্যামিটোফাইট-এর প্রথম কোষ।** কার্যকরী স্ত্রীরেণুটি বিভাজিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে স্ত্রীগ্যামিটোফাইট গঠন করে। স্ত্রীগ্যামিটোফাইট **এমব্রিয়োস্যাক** (embryo sac) বা **ভ্রূণথলি** নামেও পরিচিত। ভ্রূণথলির গঠন প্রধানত তিন প্রকার; যথা— (i) **মনোস্পোরিক** (monosporic)–এক্ষেত্রে একটি স্ত্রীরেণু ভ্রূণথলি গঠনে অংশগ্রহণ করে; (ii) **বাইস্পোরিক** (bisporic)–এক্ষেত্রে দুটি স্ত্রীরেণু ভ্রূণথলি গঠনে অংশগ্রহণ করে, এটি *Allium* type **হিসেবে পরিচিত** এবং (iii) **টেট্রাস্পোরিক** (tetrasporic)– এক্ষেত্রে চারটি স্ত্রীরেণুই ভ্রূণথলি গঠনে অংশগ্রহণ করে। টেট্রাস্পোরিক ৭ প্রকার হয়, প্রধান *Peperomia* type **যা ১৬-নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট হয়।** *Fritiliaria* type **৮-নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট।** শতকরা প্রায় ৭৫টি উদ্ভিদেই **মনোস্পোরিক** প্রক্রিয়ায় ভ্রূণথলি গঠিত হয়। তাই এখানে ভ্রূণথলি গঠনের মনোস্পোরিক প্রক্রিয়াই বর্ণনা করা হলো। মনোস্পোরিক অধিকাংশই, ৮-নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট ভ্রূণথলি গঠন করে। ব্যতিক্রম হলো *Oenothera* type **যা ৪-নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট।** মনোস্পোরিক *Polygonum* ধরন হিসেবেও পরিচিত। সর্বপ্রথম স্ট্রাসবার্গার ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে *Polygonum divaricatum* নামক উদ্ভিদে মনোস্পোরিক প্রক্রিয়ায় ভ্রূণথলি গঠনের বর্ণনা দেন।

স্ত্রীগ্যামিটোফাইট সৃষ্টি : এক্ষেত্রে ডিপ্লয়েড স্ত্রীরেণু মাতৃকোষ হতে মায়োসিস প্রক্রিয়ায় চারটি হ্যাপ্লয়েড স্ত্রীরেণু গঠিত হয় যার মধ্যে ওপরের তিনটি নষ্ট হয়ে যায় এবং নিচেরটি কার্যকরী থাকে। কার্যকরী স্ত্রীরেণু নিউক্লিয়াসটি মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে দুটি নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। নিউক্লিয়াস দুটি স্ত্রীরেণু কোষের দু' মেরুতে অবস্থান করে। প্রতিটি মেরুর নিউক্লিয়াস পরপর দু'বার বিভাজিত হয়ে চারটি করে নিউক্লিয়াস গঠন করে। প্রতিটি নিউক্লিয়াস অল্প সাইটোপ্লাজম এবং হালকা প্রাচীর দিয়ে আবৃত থাকে (কাজেই কোষও বলা যেতে পারে)। ইতোমধ্যে স্ত্রীরেণুকোষটি একটি দু'মেরু যুক্ত থলির ন্যায় অঙ্গে পরিণত হয় এবং এর প্রতি মেরুতে ৪টি করে মোট ৮টি নিউক্লিয়াস থাকে। এ অবস্থায় প্রতি মেরু হতে একটি করে নিউক্লিয়াস থলির মাঝখানে চলে আসে এবং পরস্পর মিলিত হয়, যাকে **ফিউশন নিউক্লিয়াস** বা **সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস** (fusion nucleus or secondary nucleus) বলা হয়।

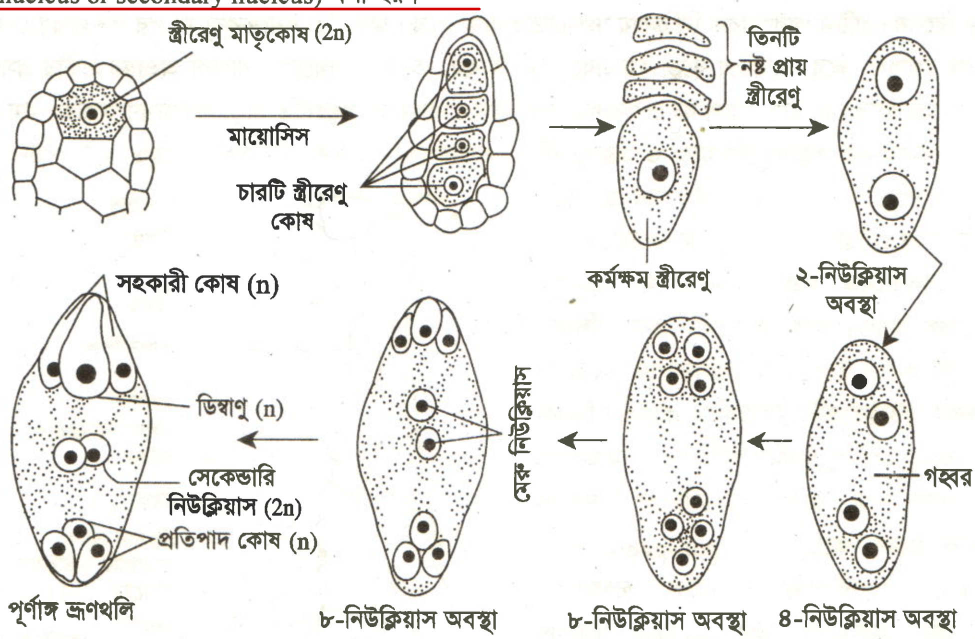

চিত্র ১০.৫ : মনোস্পোরিক প্রক্রিয়ায় স্ত্রীগ্যামিটোফাইটের বৃদ্ধির বিভিন্ন ধাপ বা স্ত্রীগ্যামিটোফাইটের বিকাশ।

ভ্রূণথলির যে মেরু ডিম্বকরন্ধ্রের দিকে থাকে সে মেরুর তিনটি নিউক্লিয়াসকে একত্রে **এগ অ্যাপারেটাস** (egg apparatus) বা **ডিম্বাণু যন্ত্র** বা **গর্ভযন্ত্র** বলে। ডিম্বাণু যন্ত্রের মাঝখানের নিউক্লিয়াসটি বড়ো থাকে, একে **এগ, ওভাম বা উস্ফিয়ার** (egg, ovum or oosphere) বলা হয়। বাংলায় একে আমরা **ডিম্বাণু** বা **স্ত্রীগ্যামিট** বলি। ডিম্বাণুর দু'পাশের দুটি নিউক্লিয়াসকে **সিনারজিড** (synergid) **বা সাহায্যকারী নিউক্লিয়াস** বা **সাহায্যকারী কোষ** বলা হয়। ভ্রূণথলির যে মেরু ডিম্বকমূলের দিকে থাকে সে মেরুর নিউক্লিয়াস তিনটিকে **প্রতিপাদ নিউক্লিয়াস** বা **প্রতিপাদ কোষ** বলে।

ভ্রূণথলি এবং এতে অবস্থিত ডিম্বাণু, সাহায্যকারী নিউক্লিয়াস, প্রতিপাদ নিউক্লিয়াস এবং সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসকে মিলিতভাবে স্ত্রীগ্যামিটোফাইট বলা হয়। ডিম্বকের মধ্যে স্ত্রীগ্যামিটোফাইটের উৎপত্তি ঘটে। স্ত্রীগ্যামিটোফাইট স্পোরোফাইটের ওপর নির্ভরশীল।

প্রতিষ্ঠিত স্ত্রীরেণুতে ৮টি নিউক্লিয়াস থাকে, এর মধ্য থেকে দু'টি মাঝখানে এসে সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। ভ্রূণথলি বিকাশের শেষ পর্যায়ে নিউক্লিয়াসের চার দিকে হালকা কোষপ্রাচীর সৃষ্টি হয়, তাই বিকশিত ভ্রূণথলি হলো আট নিউক্লিয়াস ও সাত কোষের (সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস দুটি এক প্রাচীর দ্বারা আবৃত হয়) একটি গঠন।

নিষেকক্রিয়া (Fertilization) : **অপেক্ষাকৃত বড়ো ও নিশ্চল স্ত্রীগ্যামিটের (ডিম্বাণুর) সাথে ছোটো ও সচল পুংগ্যামিটের (শুক্রাণুর) যৌন মিলনকে ফার্টিলাইজেশন** (fertilization) তথা **নিষেকক্রিয়া, নিষেক** বা **গর্ভাধান** বলে। নিষেকের পূর্বে

RMDAC

প্রয়োজন পরাগায়ন। অধিকাংশ উদ্ভিদ পরাগায়নের জন্য বায়ু বা প্রাণীর ওপর নির্ভরশীল। ২,৫০,০০০ পুষ্পক উদ্ভিদের মধ্যে শতকরা ৮৫ ভাগের ওপর উদ্ভিদই পরাগায়নের জন্য পতঙ্গ বা অন্যান্য প্রাণীর ওপর নির্ভরশীল। পরাগধানী থেকে মুক্ত পরাগরেণু বিভিন্ন বাহকের মাধ্যমে যখন একই প্রজাতির পুষ্পের গর্ভকেশরের গর্ভমুণ্ডে পতিত হয় তখন তাকে **পরাগায়ন** (Pollination) বলে। **সকল আবৃতবীজী উদ্ভিদ ও ব্যক্তবীজী উদ্ভিদে** পরাগায়ন ঘটে থাকে।

নিষিক্তকরণ প্রক্রিয়াটিকে নিম্নলিখিত উপায়ে উপস্থাপন করা যায়; (i) গর্ভমুণ্ডে পরাগরেণুর অঙ্কুরোদগম, (ii) পরাগনালিকার গর্ভাশয়মুখী যাত্রা ও শুক্রাণু সৃষ্টি, (iii) পরাগনালিকার ভ্রূণথলিতে প্রবেশ ও শুক্রাণু নিক্ষিপ্তকরণ এবং (iv) ভ্রূণথলিতে ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলন।

(i) গর্ভমুণ্ডে পরাগরেণুর অঙ্কুরোদগম : প্রথমে পরাগরেণু স্বপ্রজাতি শনাক্ত করে। গর্ভমুণ্ডের বিশেষ প্রোটিন এবং পরাগরেণুর বিশেষ প্রোটিন পারস্পরিক বিক্রিয়ায় স্বপ্রজাতি শনাক্ত করে। স্বপ্রজাতি শনাক্তকরণের পর পরাগরেণু সেখান থেকে তরল পদার্থ শোষণ করে আকারে বড়ো হয় এবং অঙ্কুরিত হয়। অর্থাৎ পরাগরেণুর পাতলা অভ্যন্তর প্রাচীর প্রসারিত হয়ে রেণুরন্ধ্র পথে নলাকারে বের হয়ে আসে যাকে পরাগনালিকা বলে। সাধারণত স্বপ্রজাতি ছাড়া পরাগরেণু অঙ্কুরিত হয় না।

(ii) পরাগনালিকার গর্ভাশয়মুখী যাত্রা ও শুক্রাণু সৃষ্টি: পরাগনালিকাটি ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে গর্ভমুণ্ড হতে গর্ভদণ্ডের ভেতর দিয়ে গর্ভাশয় পর্যন্ত পৌঁছায় এবং গর্ভাশয়ের স্তর ভেদ করে ডিম্বক পর্যন্ত পৌঁছায়। পরাগনালিকা কর্তৃক নিঃসৃত সেলুলেজ, পেকটিনেজ ইত্যাদি এনজাইম গর্ভমুণ্ডের ভেতরের কোষ বিগলন করে অগ্রসরমান পরাগনালিকার গমন পথ সৃষ্টি করে। ইতোমধ্যে পরাগনালিকার ভেতরে অবস্থিত **জনন নিউক্লিয়াসটি** মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে দুটি শুক্রাণু তথা পুংগ্যামিট সৃষ্টি করে। অধিকাংশ উদ্ভিদে (যেমন-আম, জাম) পরাগনালিকা ডিম্বকরন্ধ্র পথে ডিম্বকে প্রবেশ করে, একে **porogamy** বলে। ডিম্বক রন্ধ্রে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত পরাগনালিকা ক্যালসিয়াম আয়ন বা অন্য রাসায়নিক বস্তুর gradient অনুসরণ করে। কিছু কিছু উদ্ভিদে (যেমন-*Casuarina*-ঝাউ) পরাগনালিকা ডিম্বকমূল দিয়ে ডিম্বকে প্রবেশ করে, একে **chalazogamy** বলে। কোনো কোনো উদ্ভিদে (যেমন-লাউ, কুমড়া) পরাগনালিকা ডিম্বকত্বক ভেদ করে ডিম্বকে প্রবেশ করে, একে **mesogamy** বলে। সাধারণত একটি মাত্র নালিকাই ডিম্বকে প্রবেশ করে। অধিকাংশ উদ্ভিদে **পোরোগ্যামি** প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়।

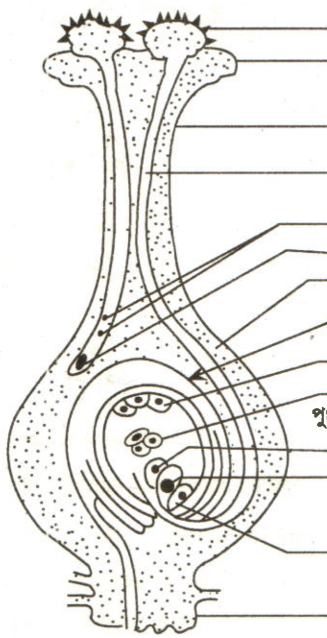

চিত্র ১০.৬ : আবৃতবীজী উদ্ভিদের নিষেকক্রিয়া।

(iii) পরাগনালিকার ভ্রূণথলিতে প্রবেশ ও শুক্রাণু নিক্ষিপ্তকরণ : পরাগনালিকা প্রথমে গর্ভাশয়ের স্তরভেদ করে ডিম্বকে প্রবেশ করে। ইতোমধ্যে ডিম্বকে অবস্থিত স্ত্রীরেণু হতে ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়। ডিম্বাণু ভ্রূণথলিতেই অবস্থান করে। পরাগনালিকাও শেষ পর্যন্ত ভ্রূণথলিতে প্রবেশ করে। মনে করা হয় কিছু বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ পরাগনালির গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করে। ভ্রূণথলিতে প্রবেশ করে এটি সাহায্যকারী কোষের ওপর দিয়ে ডিম্বাণুর নিকট পৌঁছে। পরে পরাগনালিকার অগ্রভাগ প্রসারিত হয়ে ফেটে যায় এবং **শুক্রাণু** তথা **পুংগ্যামিট** ভ্রূণথলিতে নিক্ষিপ্ত হয়। অনেক সময় পরাগনালিকার চাপে একটি সাহায্যকারী কোষ ধ্বংস হয়ে যায়।

(iv) ভ্রূণথলিতে ডিম্বাণুর সাথে একটি এবং গৌণ নিউক্লিয়াসের সাথে একটি শুক্রাণুর মিলন : পরাগনালিকা হতে ভ্রূণথলিতে নিক্ষিপ্ত দুটি পুংগ্যামিটের মধ্যে একটি ডিম্বাণুর সাথে মিলিত ও একীভূত হয়ে যায় অর্থাৎ **নিষেকক্রিয়া** সম্পন্ন করে। এ প্রকার মিলনকে **সিনগ্যামি** (syngamy) বলে। প্রকৃতপক্ষে **ডিম্বাণুর সাথে শুক্রাণুর মিলনই হলো নিষেকক্রিয়া।** অপর পুংগ্যামিটটি সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত ও একীভূত হয়। এ প্রকার মিলনকে **ত্রিমিলন** (triple fusion) বলে।

দ্বিনিষেকক্রিয়া বা দ্বিনিষেক (Double fertilization) : একই সময়ে ডিম্বাণুর সাথে একটি পুংগ্যামিটের মিলন ও সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে অপর পুংগ্যামিটের মিলন প্রক্রিয়াকে দ্বিনিষেকক্রিয়া (double fertilization) বা দ্বিগর্ভাধান প্রক্রিয়া বলে। **দ্বিনিষেক আবৃতবীজী উদ্ভিদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য** (নগ্নবীজী উদ্ভিদের *Ephedra*-তে দ্বিনিষেক আবিস্কৃত হয় ১৯৯০ সালে –এটি ব্যতিক্রম)।

এ প্রক্রিয়ায় একটি পুংগ্যামিট ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয় এবং অপর একটি পুংগ্যামিট সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হয়; ফলে ডিম্বাণু জাইগোটে পরিণত হয় এবং ডিপ্লয়েড অবস্থাপ্রাপ্ত হয় কিন্তু সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস **ট্রিপ্লয়েড** অবস্থাপ্রাপ্ত হয়। সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে একটি পুংগ্যামিটের মিলনকে **ত্রিমিলন** (triple fusion) বলা হয়। কারণ এতে দুটি মেরু নিউক্লিয়াস ও একটি পুংনিউক্লিয়াস–এ তিনটি নিউক্লিয়াসের মিলন ঘটে।

নিষেক ও দ্বি-নিষেক এর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	নিষেক	দ্বি-নিষেক
১. সংজ্ঞা	স্ত্রীগ্যামিট তথা ডিম্বাণুর সাথে একটি পুংগ্যামিটের যৌন মিলনের নাম নিষেক।	নিষেকের সময় প্রায় একই সাথে ১টি পুংগ্যামিট ডিম্বাণুর সাথে এবং অন্য ১টি পুংগ্যামিট সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হওয়াকে দ্বি-নিষেক বলে।
২. কোন উদ্ভিদে ঘটে	এটি অধিকাংশ উদ্ভিদে হয়ে থাকে।	এটি কেবলমাত্র আবৃতবীজী উদ্ভিদে সংঘটিত হয়। (ব্যক্তবীজী *Ephedra* ব্যতিক্রম)।
৩. গ্যামিটের প্রয়োজনীয়তা	শুধুমাত্র ১টি পুংগ্যামিটের প্রয়োজন হয়।	২টি পুংগ্যামিটের প্রয়োজন হয়।
৪. ফলাফল	শুধুমাত্র ভ্রূণের উৎপত্তি হয়।	ভ্রূণ ও সস্যটিস্যু উৎপন্ন করে।

নিষেকের পরিণতি (After effects of fertilization) : গর্ভাশয় থেকে ফল সৃষ্টি, ডিম্বক থেকে বীজ সৃষ্টি এবং বীজ হতে নতুন বংশধর সৃষ্টি হলো নিষেকের চূড়ান্ত পরিণতি। নিচে নিষেকের পরিণতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো:

১। ভ্রূণের পরিস্ফুটন : নিষেকের ফলে অর্থাৎ হ্যাপ্লয়েড (n) ডিম্বাণুর সাথে হ্যাপ্লয়েড (n) শুক্রাণুর যৌন মিলনের ফলে যে ডিপ্লয়েড (n + n = 2n) কোষের সূচনা হয়, তাকে **জাইগোট** বা **উস্পোর** (zygote or oospore) বলে। নিষিক্ত ডিম্বাণু তথা **জাইগোটই হলো স্পোরোফাইটের** প্রথম কোষ। জাইগোট তার চারপাশে একটি প্রাচীর নিঃসৃত করে এবং কিছু সময় সুপ্ত অবস্থায় থাকে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং প্রজাতি বিশেষে জাইগোটের সুপ্তিকাল ভিন্নতর হয়। সুপ্ত অবস্থা কেটে গেলে এতে মাইটোটিক বিভাজন শুরু হয়। প্রথম বিভাজন সাধারণত আড়াআড়ি (transversely) ভাবে হয়, ফলে একটি দ্বিকোষী আদিভ্রূণ (proembryo) গঠিত হয়। আদিভ্রূণটি ক্রম বিভাজন ও বিকাশের মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ ভ্রূণে পরিণত হয়।

২। সস্যের উৎপত্তি : সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের (2n) সাথে একটি শুক্রাণুর (n) মিলনের ফলে যে ট্রিপ্লয়েড (3n) এন্ডোস্পার্ম নিউক্লিয়াস গঠিত হয় তা বার বার বিভাজন ও বিকাশের মাধ্যমে সস্য বা এন্ডোস্পার্ম টিস্যু গঠন করে। এ সময় প্রচুর পরিমাণ খাদ্য উপাদান উদ্ভিদের অন্যান্য অংশ থেকে এসে সস্যটিস্যু সৃষ্টিতে সহায়তা করে। সস্যটিস্যু প্রচুর পরিমাণ স্টার্চ, লিপিড ও প্রোটিন জমা করে।

৩। ফল সৃষ্টি : ফল হলো রূপান্তরিত গর্ভাশয় যা নিষেকের পর বিকশিত হয়। **নিষেকের ফলে গর্ভাশয় উদ্দীপ্ত হয়ে ফলে পরিণত হয়।** নিষেক শেষে পুষ্পের স্তবকগুলো নিস্তেজ হয়ে এক সময় ঝরে পরে। গর্ভদণ্ড ও গর্ভমুণ্ড শুকিয়ে যায়। গর্ভাশয়

পরিপক্ব হয়ে মাতৃউদ্ভিদ থেকে পৃথকও হয়ে যায়। ফলের আকার, আকৃতি ও বৈশিষ্ট্যে রয়েছে সীমাহীন বৈচিত্র্য। প্রত্যেকটি উদ্ভিদের **ফল** দেখে তার উৎস-উদ্ভিদকে নিশ্চিত করা যায়। ফল বীজকে পুষ্টি দান করে এবং বিসরণে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। ফল সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য বীজের বিস্তার ঘটানো।

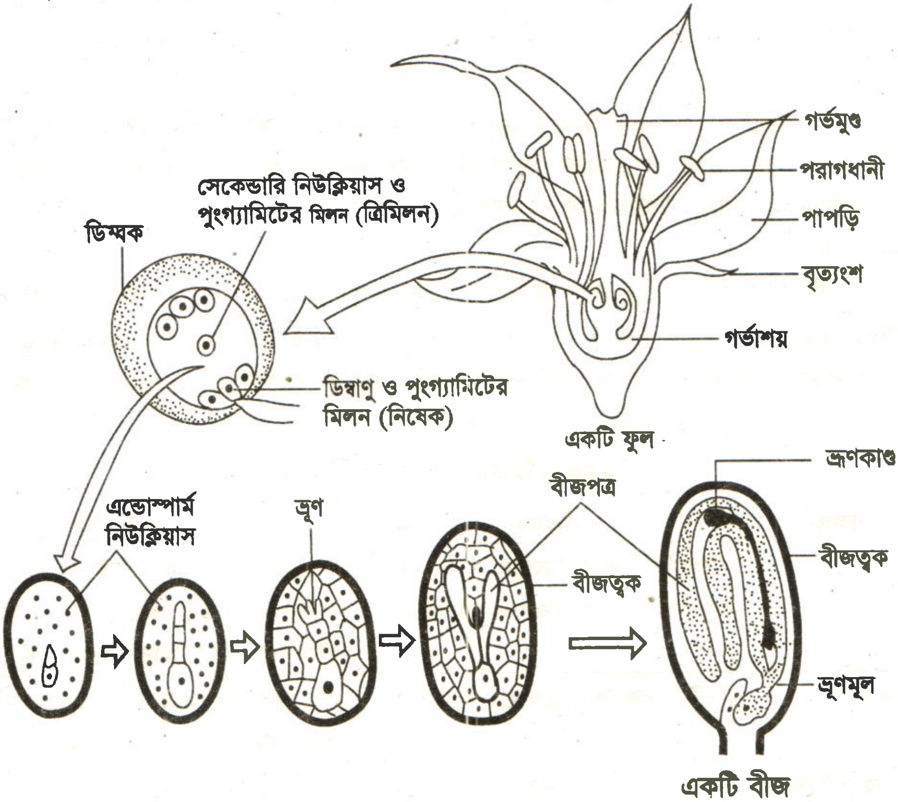

চিত্র ১০.৭ : বীজ সৃষ্টি প্রক্রিয়া।

৪। বীজ সৃষ্টি : ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ এবং আবৃতবীজী উদ্ভিদে বীজ সৃষ্টি হয়। নিষেকের পর বিভিন্ন ধরনের বিভাজন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে **ডিম্বক** (ovule) ক্রমান্বয়ে বীজে পরিণত হয়।

জাইগোটস্থ আদিভ্রূণ ক্রমবিভাজন ও পরিস্ফুটনের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত একটি ভ্রূণ গঠন করে। ভ্রূণে থাকে **বীজপত্র** (cotyledon), **ভ্রূণকাণ্ড** (plumule) ও **ভ্রূণমূল** (radicle)। একই সাথে সস্য বা এন্ডোস্পার্মও (endosperm) গঠিত হয়। ভ্রূণ পরিস্ফুটনের সময় ভ্রূণপোষক টিস্যু (nucellus) ভ্রূণকে পুষ্টি দান করে, ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটি নিঃশেষ হয়ে যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটি **পরিভ্রূণ** (মাত্র একটি আবরণ) হিসেবে অবস্থান করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এন্ডোস্পার্মও নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে, এরূপ বীজকে অসস্যল বীজ বলে।

নিষেকের পর ডিম্বকের অভ্যন্তরে এরূপ পরিবর্তনের সাথে সাথে ডিম্বকের ত্বক দুটি অপেক্ষাকৃত কঠিন ও শুষ্ক হয়ে বীজত্বকে পরিণত হয়। রসালো ডিম্বকটি পানি হারিয়ে অপেক্ষাকৃত কঠিন ও শুষ্ক হয়ে বীজে পরিণত হয়। এরূপ পরিবর্তনকালে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বীজের একটি তৃতীয় স্তর সৃষ্টি হয়, যাকে **এরিল** (aril) বলে। **লিচু, কাঠলিচু** ও **জায়ফলে** এরূপ এরিল দেখা যায়। শাপলা বীজেও এরিল আছে। লিচু ও কাঠলিচুর এরিল হলো ভোজ্য অংশ।

যাহোক নিষেকের পর ডিম্বকটি বিভিন্ন পরিবর্তনের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত বড়ো, শক্ত ও শুষ্ক হয়ে একটি বীজে পরিণত হয়। অঙ্কুরোদগমের পর বীজ হতে প্রজাতি অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ আত্মপ্রকাশ করে।

প্রজননের সফলতা নির্ভর করে : (i) পরাগায়ন, (ii) নিষিক্তকরণ ও (iii) বীজের বিস্তারের ওপর।

নিষেকের পর গর্ভাশয় (ডিম্বাশয়) এবং ডিম্বকের বিভিন্ন পরিবর্তন	
নিষেকের আগে	**নিষেকের পরে বিকশিত হলে**
১। গর্ভাশয়	১। ফল
২। গর্ভাশয় প্রাচীর	২। ফলত্বক
৩। ডিম্বক	৩। বীজ MAT 18-19
৪। ডিম্বক বহিঃত্বক বা এক্সাইন	৪। টেস্টা (বীজ বহিঃত্বক)
৫। ডিম্বক অন্তঃত্বক বা ইন্টাইন	৫। টেগমেন (বীজ অন্তঃত্বক)
৬। নিউসেলাস বা ভ্রূণপোষক টিস্যু	৬। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিঃশেষ হয়ে যায়, কিঞ্চিৎ থাকলে তা পেরিস্পার্ম (পরিভ্রূণ) হয়
৭। ডিম্বাণু বা এগ	৭। ভ্রূণ (embryo)
৮। সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস	৮। এন্ডোস্পার্ম বা সস্য
৯। সহকারী কোষ বা সিনারজিড	৯। নষ্ট হয়ে যায়
১০। অ্যান্টিপোডাল বা প্রতিপাদকোষ	১০। নষ্ট হয়ে যায়
১১। মাইক্রোপাইল বা ডিম্বকরন্ধ্র	১১। বীজের মাইক্রোপাইল (বীজরন্ধ্র)
১২। হাইলাম বা ডিম্বকনাভী	১২। হাইলাম (বীজনাভী) MAT 18-19
১৩। ফিউনিকুলাস বা ডিম্বকনাড়ী	১৩। বীজের বোঁটা (বীজবৃন্ত)
১৪। ক্যালাজা বা ডিম্বকমূল	১৪। নষ্ট হয়ে যায় (বীজমূল)

নিষেকক্রিয়ার গুরুত্ব বা তাৎপর্য (Significance of fertilization)

১. **ক্রোমোসোমের ভারসাম্য রক্ষায় :** নিষেক প্রক্রিয়ায় ডিম্বাণু ও পুংগ্যামিটের মিলনের ফলে জাইগোট উৎপন্ন হয়। এ প্রক্রিয়ায় দু' প্রস্থ হ্যাপ্লয়েড (n) ক্রোমোসোম মিলিত হয়ে ডিপ্লয়েড (2n) অবস্থা ফিরে আসে। ফলে প্রজাতির ক্রোমোসোম সংখ্যার স্থিরতা রক্ষিত হয়।

২. **ফল ও বীজ সৃষ্টি :** নিষেকের উদ্দীপনায় ডিম্বাশয় ও ডিম্বক পর্যায়ক্রমে ফল ও বীজে পরিণত হয়।

৩. **নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি :** নিষেকের ফলে বংশধরদের মধ্যে নতুন বৈশিষ্ট্যের সঞ্চার ঘটে। কখনো নতুন প্রজাতি সৃষ্টিরও সম্ভাবনা থাকে।

৪. **বিবর্তনে :** নিষেকের পরে সৃষ্ট প্রকরণ বিবর্তনের ধারা নির্দেশ করে।

৫. **অধিক ফলনশীল ও সহনশীল ফসল সৃষ্টি :** নিষেক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অধিক ফলনশীল ও সহনশীল ফসল উৎপন্ন হয়।

৬. **উদ্ভিদের বংশরক্ষা :** নিষেকক্রিয়ার মাধ্যমে ফল ও বীজ সৃষ্টি হয়। বীজ উদ্ভিদের বংশরক্ষা করে। বীজের সৃষ্টি না হলে বেশির ভাগ সপুষ্পক উদ্ভিদই বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতো।

৭. **খাদ্যের যোগান :** উদ্ভিদের ফল ও বীজের ওপরই প্রাণিকুল বিশেষ করে মানুষ নির্ভরশীল। কাজেই নিষেকক্রিয়া যত না গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদকুলের জন্য তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ মানবজাতির জন্য। আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, পেঁপে, বেল, ধান, গম, ভূট্টা প্রভৃতি যা খেয়ে থাকি তা সবই নিষেকক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয়।

৮. **জেনেটিক ডাইভারসিটি সৃষ্টি :** যৌনপ্রজননে নিষেকক্রিয়ায় জিনের মিশ্রণ (রিকম্বিনেশন) ঘটে। এর ফলে জেনেটিক ডাইভারসিটি সৃষ্টি হয়।

যৌন প্রজননের সুফল

১। যৌন প্রজননের ফলে রিকম্বিনেশনের মাধ্যমে জেনেটিক ডাইভার্সিটি তৈরি হয়।

২। জেনেটিক ডাইভার্সিটির কারণে উদ্ভিদের নতুন ও পরিবর্তিত পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে সুবিধা হয়।

৩। নতুন প্রকরণ সৃষ্টি হতে পারে।

৪। আমাদের খাদ্য দানা, তৈলবীজ ইত্যাদি এর মাধ্যমেই পেঁয়ে থাকি।

২। অযৌন প্রজনন (Asexual reproduction) : পুং ও স্ত্রীগ্যামিটের মিলন ছাড়া উদ্ভিদের যে প্রজনন ঘটে তাকে অযৌন প্রজনন বলে। নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদে অযৌন স্পোর সৃষ্টির মাধ্যমে অযৌন জনন হয়ে থাকে। আবৃতবীজী উদ্ভিদে সাধারণত দেহ অঙ্গের মাধ্যমে অযৌন জনন হয়ে থাকে। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো-

(a) অযৌন স্পোর সৃষ্টির মাধ্যমে : নিম্নশ্রেণির বেশকিছু উদ্ভিদে বিভিন্ন ধরনের **রেণু বা স্পোর** (spore) তৈরি হয়। এসব স্পোর অঙ্কুরিত হলে নতুন উদ্ভিদের জন্ম হয়। অনুকূল পরিবেশে এসব স্পোরে মাইটোসিস বিভাজন ঘটে এবং নতুন উদ্ভিদের জন্ম দেয়।

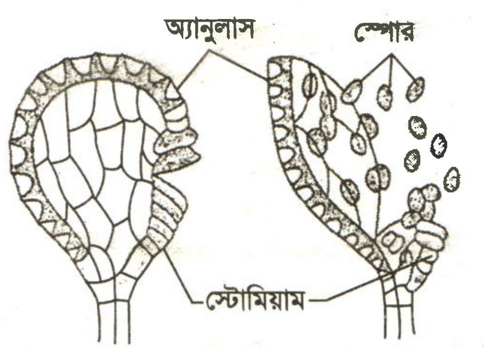

চিত্র ১০.৮ : ফার্নের স্পোরাঞ্জিয়াম (বাঁয়ে) ও এর বিদারণ (ডানে)

পরিবেশের তারতম্যে অধিকাংশ ছত্রাক ও শৈবাল বিভিন্ন প্রকার স্পোর গঠন করে। এদের মধ্যে পেনিসিলিয়ামের কনিডিয়া (conidia) বা কনিডিওস্পোর (conidiospore), মিউকরের স্পোরানজিওস্পোর (sporangiospore) বা গনিডিয়া (gonidia), অ্যাগারিকাসের বেসিডিওস্পোর (basidiospore) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এদিকে শৈবালের মধ্যে ক্ল্যামাইডোমোনাস চলরেণু বা জুওস্পোর (zoospore) এবং স্থিররেণু (resting spore) বা অ্যাকাইনেটি (akinete) এবং অন্যান্য বহু শৈবালের স্থুল প্রাচীরাবদ্ধ অ্যাপ্ল্যানোস্পোর (aplanospore) ইত্যাদি হলো বিভিন্ন ধরনের অযৌন স্পোর। এছাড়া ব্রায়োফাইটা ও টেরিডোফাইটাভুক্ত উদ্ভিদের রেণুথলিতে (sporangium) উৎপন্ন রেণুগুলো অযৌন প্রক্রিয়ায় বংশবিস্তারে সহায়ক। ফার্ন (fern) ও লাইকোপোডিয়াম (*Lycopodium*)-এর স্পোর সম-আকৃতির অর্থাৎ হোমোস্পোরাস (homoporous), কিন্তু সেলাজিনেলা (*Selaginella*), শুষনি শাক (*Marsilea*) ইত্যাদির স্পোর অসম-আকৃতির অর্থাৎ হেটারোস্পোরাস (heterosporous)।

(b) দেহ অঙ্গের মাধ্যমে : আবৃতবীজী উদ্ভিদে দেহ অঙ্গের মাধ্যমে অযৌন প্রজনন হয়ে থাকে। এরূপ জননকে **অঙ্গজ প্রজনন** (vegetative reproduction) বলা হয়। অন্যভাবে, দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন অংশবিশেষ নতুন জীব সৃষ্টি করলে তাকে অঙ্গজ প্রজনন বলে। প্রকৃতিতে অনেক উদ্ভিদে স্বাভাবিকভাবেই অঙ্গজ প্রজনন হয়ে থাকে। আবার কৃত্রিম উপায়েও অঙ্গজ প্রজনন করা হয়। নিচে বিভিন্ন ধরনের অঙ্গজ প্রজনন সম্বন্ধে বর্ণনা করা হলো :

(ক) উদ্ভিদের স্বাভাবিক অঙ্গজ প্রজনন : নিম্নলিখিত উপায়ে স্বাভাবিক অঙ্গজ প্রজনন ঘটতে পারে।

(i) মূল দ্বারা (By roots) : মিষ্টি আলু, ডালিয়া, শতমূলী, কাঁকরোল, পটল প্রভৃতি উদ্ভিদের মূল থেকেই নতুন গাছের সৃষ্টি হয়। জমিতে এদের মূল লাগানো হয়।

(ii) কাণ্ড দ্বারা (By stem) : গোলআলু, আদা, পিঁয়াজ, সটি, ওলকচু প্রভৃতি উদ্ভিদের কাণ্ড থেকেই নতুন উদ্ভিদের জন্ম হয়। কলা, পুদিনা, আনারস. চন্দ্রমল্লিকা, বাঁশ এগুলোর **সাকার**-এর (বিশেষ কাণ্ড) সাহায্যে প্রজনন হয়।

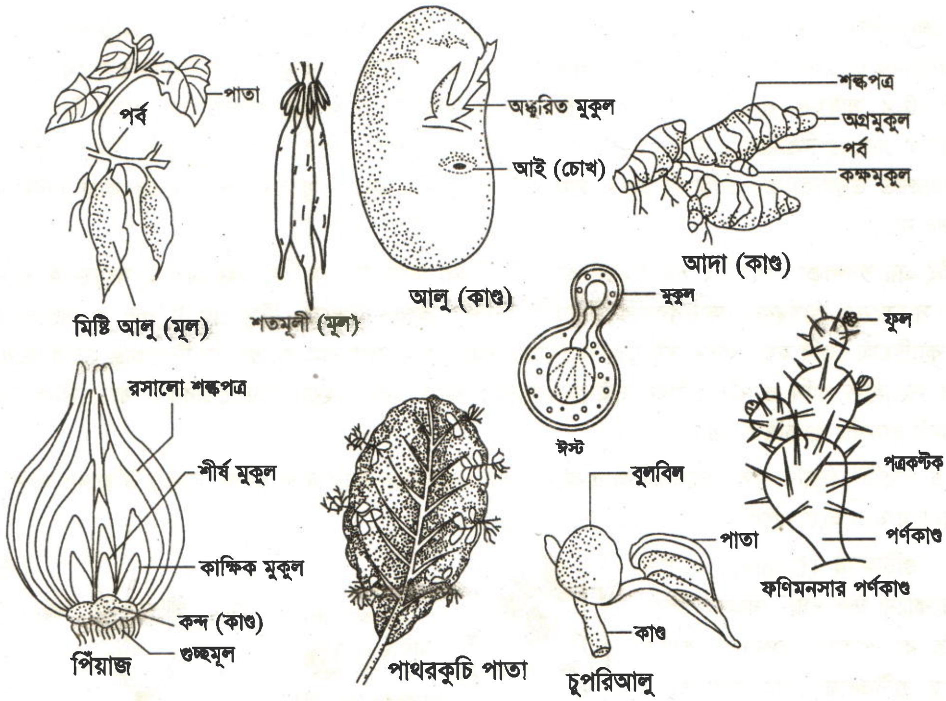

চিত্র ১০.৯ : কয়েকটি উদ্ভিদের স্বাভাবিক অঙ্গজ প্রজনন অঙ্গ।

(iii) পাতার মাধ্যমে (By leaf) : পাথরকুচি পাতা মাটিতে ফেলে রাখলেই একটি পাতার কিনারা থেকে বহু নতুন গাছের জন্ম হয়। এগুলোই হলো স্বাভাবিক অঙ্গজ প্রজনন-এর উদাহরণ।

(iv) বুলবিল বা কক্ষমুকুল : কোনো কোনো উদ্ভিদে পরিবর্তিত কক্ষমুকুল তথা বুলবিল দ্বারা বংশ বৃদ্ধি ঘটে। যেমন— চুপরিআলু।

(v) অর্ধবায়বীয় কাণ্ড দ্বারা : কচুজাতীয় উদ্ভিদে অর্ধবায়বীয় কাণ্ড (রানার যা লতি হিসেবে পরিচিত) দ্বারা বংশ বৃদ্ধি ঘটে। আমরুল শাকের স্টোলন দ্বারা বংশ বৃদ্ধি ঘটে।

(vi) মুকুলোদগম (Budding) : ঈস্ট নামক এককোষী ছত্রাকের মাতৃকোষ থেকে এক বা একাধিক মুকুল সৃষ্টি হয়। মুকুলগুলো মাতৃকোষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন ঈস্টের জন্ম দেয়।

(vii) পর্ণকাণ্ড দ্বারা : ফণিমনসার পর্ণকাণ্ড থেকে নতুন গাছ হয়।

(খ) উদ্ভিদের কৃত্রিম অঙ্গজ প্রজনন : উদ্ভিদের কোনো দৈহিক অঙ্গ যেমন— মূল, কাণ্ড, পাতা ইত্যাদির মাধ্যমে বিশেষ প্রক্রিয়ায় বংশবিস্তার করার প্রক্রিয়াকে কৃত্রিম অঙ্গজ প্রজনন বলে। কৃত্রিম পদ্ধতি প্রয়োগ করে ফুল ও ফলের গুণগতমান বজায় রেখে এ ধরনের জনন ঘটানো হয়। যে পদ্ধতিতে এটি সম্ভব তাকে **কলম করা** বলে। কলম নিম্নলিখিত উপায়ে করা হয়ে থাকে।

(i) কাটিং বা স্লিপ (Cutting or Slip) : জবা, আখ, গোলাপ, পাতাবাহার, সজিনা, আপেল, কমলালেবু ইত্যাদি গাছের পরিণত কাণ্ডের অংশবিশেষ কেটে সিক্ত বা ভিজে মাটিতে পুঁতলে তা থেকে শিকড় গজায় এবং স্বতন্ত্র নতুন উদ্ভিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

(ii) দাবাকলম (Layering) : লেবু, যুঁই প্রভৃতি গাছের মাটি সংলগ্ন লম্বা শাখাকে বাঁকিয়ে মাটিতে চাপা দিলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মাটির মধ্যে অবস্থিত শাখাটির পর্ব থেকে অস্থানিক মূল নির্গত হয়। মাটিতে চাপা পড়া অংশের বাকল (ছাল) কেটে দিলে সেখানে দ্রুত মূল গজায়। মূলসহ শাখাটি কেটে অন্য জায়গায় লাগালে নতুন উদ্ভিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

(iii) জোড়কলম (Grafting) : বিভিন্ন ফল ও ফুল গাছের উন্নতজাত বজায় রাখার জন্য জোড়কলম তৈরি করা হয়। নির্বাচিত উদ্ভিদের কোনো শাখা টবে লাগানো সাধারণত একই প্রজাতিভুক্ত অন্য একটি উদ্ভিদের সাথে জুড়ে দিতে হয়। বিচ্ছিন্ন অংশটিকে **সাইয়ন** (scion) বলে এবং সাইয়নকে যে উদ্ভিদের সাথে জোড়া দেয়া হয় তাকে **স্টক** (stock) বলে। স্টক যেকোনো ধরনের নিম্নমানের উদ্ভিদ হতে পারে। মাটির রস শোষণ করে ওপরে পাঠানোই স্টকের কাজ। অন্যদিকে সাইয়ন সাধারণত উন্নতজাতের উদ্ভিদের অংশ হয়ে থাকে। সুতরাং ফল ও ফুলের চরিত্র নির্ভর করে সাইয়নের ওপর— স্টকের ওপর নয়।

গ্রাফটিং-এর সফলতা : গ্রাফটিং সফল হতে হলে স্টক এবং সাইয়নের ক্যাম্বিয়ামদ্বয় একত্রে সংযুক্ত হতে হবে। প্রথমে স্টক এবং সাইয়নের ক্যাম্বিয়াম ক্ষতপূরণের টিস্যুপিণ্ড উৎপন্ন করে। উভয়ের টিস্যুপিণ্ড মিলিত ও সংযুক্ত হলে একটি নিরবচ্ছিন্ন ক্যাম্বিয়াম তৈরি হয়। নতুন সৃষ্ট যুক্ত ক্যাম্বিয়াম একই সাথে জাইলেম ও ফ্লোয়েম টিস্যুগুচ্ছ তৈরি করে। এর ফলে স্টক কর্তৃক সংগৃহীত পানি ও খনিজ লবণ সাইয়নে আসতে পারে এবং সাইয়ন হতে তৈরিকৃত খাদ্য স্টক টিস্যুতে যেতে পারে। তখনই গ্রাফটিং প্রতিষ্ঠিত হয়।

কৃষিতে গ্রাফটিং পদ্ধতি খুবই প্রয়োজনীয় একটি উপায়। বর্তমানে অধিকাংশ ফলদ কাষ্ঠল উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি গ্রাফটিং পদ্ধতির মাধ্যমে করা হয়ে থাকে।

(iv) গুটিকলম (Gootee) : শক্ত কাণ্ডযুক্ত যেকোনো ফল গাছ, যেমন— লেবু, আম প্রভৃতি বা গোলাপ, গন্ধরাজ প্রভৃতি ফুলের গাছে গুটিকলম তৈরি করা যায়। গুটিকলমের জন্য নির্বাচিত শাখার একটি অংশের বাকল (ছাল) ছাড়িয়ে সেখানে গোবর-মাটি ও খড় দিয়ে ঢেকে শক্ত করে দড়ি বেঁধে দিতে হয়। নিয়মিত সেখানে পানি দিতে থাকলে ঐ অংশে কিছুদিন পর অস্থানিক মূল গজায়। মূলসহ শাখাটি ধীর পদ্ধতিতে বিচ্ছিন্ন করে মাটিতে অন্যত্র রোপণ করলে তা থেকে নতুন উদ্ভিদ জন্মায়।

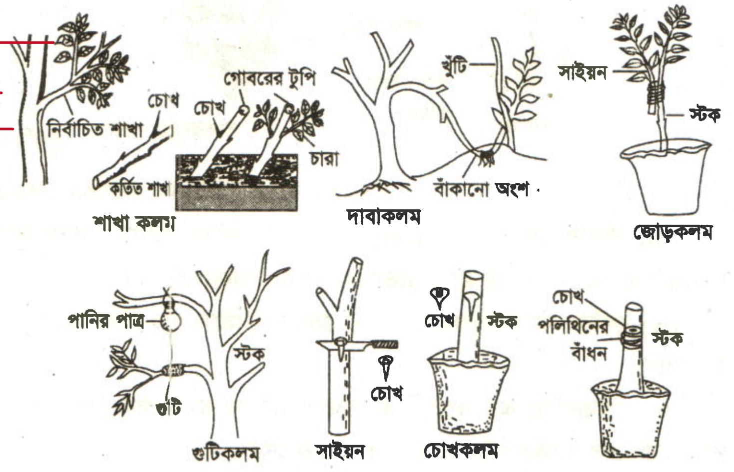

চিত্র ১০.১০ : কৃত্রিম অঙ্গজ প্রজনন। (কলম করার বিভিন্ন পদ্ধতি)।

(v) চোখকলম বা কুঁড়ি সংযোজন (Budding) : এ পদ্ধতিতে একটি গাছের কাণ্ডে অন্য গাছের কাক্ষিক মুকুল সংযুক্ত করা হয়। যে গাছের কাণ্ডে মুকুল সংযোজন করা হবে তার সুবিধামতো শাখায় ছুরি (নাইফ) দিয়ে T-আকারে বাকল আলগা করে সেস্থানে কাঙ্ক্ষিত গাছের একটি মুকুল (অনুরূপ আকারে) নিয়ে বায়ুরোধী করে বেঁধে দেয়া হয়। কয়েক দিনের মধ্যে মুকুলটি মাতৃগাছের সাথে সংযুক্ত হয় এবং দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করে নতুন শাখা উৎপন্ন করে। যেমন— কুল (বরই), গোলাপ গাছে এ প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়।

সার্থক কৃত্রিম অঙ্গজ প্রজননের জন্য চাই অভিজ্ঞতা, চাই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কিছু রাসায়নিক পদার্থ যেমন— অক্সিন (মূল তৈরির জন্য), মোম ইত্যাদি।

(vi) মাইক্রোপ্রোপাগেইশন : অযৌন জননের মাধ্যমেই কাঙ্ক্ষিত প্রকরণের বংশবৃদ্ধি করা হয়ে থাকে। এজন্য বহু সনাতন পদ্ধতি পূর্ব থেকেই প্রচলিত আছে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে এ লক্ষ্যে মাইক্রোপ্রোপাগেইশন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। অতি ক্ষুদ্র একটু টিস্যু থেকে অসংখ্য চারা সৃষ্টি করা যায় বলেই এ পদ্ধতির নাম দেয়া হয়েছে মাইক্রোপ্রোপাগেইশন।

সুবিধা

১। প্রচলিত সনাতন পদ্ধতিসমূহের তুলনায় এ পদ্ধতিতে স্বল্প সময়ে যেকোনো কাঙ্ক্ষিত নতুন প্রকরণের অসংখ্য চারা উৎপাদন করে অল্প সময়ে সংখ্যা বৃদ্ধি করে নেয়া যায়।

২। ভাইরাসমুক্ত চারা তৈরি করা যায়।

৩। বিরল উদ্ভিদের বহুসংখ্যক চারা উৎপাদন করে স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করা যায় (এবং বন্য আবাস থেকে আহরণ কমানো যায়)। (টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে এটা করা হয় : বিস্তারিত জীবপ্রযুক্তি অধ্যায়)

উচ্চতর উদ্ভিদেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে অযৌন জননই বংশবৃদ্ধির একমাত্র উপায় হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ Novel Orange এর উল্লেখ করা যায়। উনিশ শতকের প্রথম দিকে ব্রাজিলে কমলার বীজ থেকে এমন একটি চারা হয় যার পুষ্পপত্রসমূহ বিকশিত হয় না কিন্তু উন্নতমানের বীজহীন কমলার ফলন হয়। বর্তমানে উৎপাদিত সকল Novel Orange ঐ এক গাছেরই অযৌন জননের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত গাছ থেকে আসছে।

অপুংজনি (Parthenogenesis) : উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদে সাধারণত ডিম্বাণুর সাথে শুক্রাণুর মিলন তথা নিষেকের ফলে ভ্রূণ সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে ডিম্বাণু নিষিক্ত না হয়ে সরাসরি ভ্রূণ সৃষ্টি করে থাকে। যে প্রজনন প্রক্রিয়ায় ডিম্বাণুটি নিষেক ছাড়াই ভ্রূণ সৃষ্টি করে এবং ডিম্বক স্বাভাবিক বীজে পরিণত হয় তাকে **পার্থেনোজেনেসিস** বা **অপুংজনি** বলে। হরমোন প্রয়োগে বীজহীন ফল উৎপাদন প্রক্রিয়াকে **পার্থেনোকার্পি** (parthenocarpy) বলে। উদাহরণ- লেবু, কমলালেবু প্রভৃতি। আমরা যে বীজহীন কলা খাই তাও একটি পার্থেনোকার্পিক ফল।

পার্থেনোজেনেসিস প্রধানত দু'প্রকার। যথা : (i) হ্যাপ্লয়েড পার্থেনোজেনেসিস এবং (ii) ডিপ্লয়েড পার্থেনোজেনেসিস।

(i) হ্যাপ্লয়েড পার্থেনোজেনেসিস (Haploid Parthenogenesis) : যখন স্বাভাবিক মায়োসিস প্রক্রিয়ায় ডিম্বাণু সৃষ্টি হলেও তা নিষিক্ত না হয়ে সরাসরি ভ্রূণের সৃষ্টি করে তখন তাকে **হ্যাপ্লয়েড পার্থেনোজেনেসিস** বলে। এ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট উদ্ভিদও হ্যাপ্লয়েড হয় এবং অনুর্বর হয়। *Solanum nigrum, Orchis maculata* উদ্ভিদে অনিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়।

(ii) ডিপ্লয়েড পার্থেনোজেনেসিস (Diploid Parthenogenesis) : যখন স্বাভাবিক মায়োসিস প্রক্রিয়ার বদলে মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় ডিম্বাণু (2n) সৃষ্টি হয় এবং পরে ভ্রূণে পরিণত হয় তাকে **ডিপ্লয়েড পার্থেনোজেনেসিস** বলে। *Parthenium argentatum* ও *Taraxacum albidum* উদ্ভিদে ডিপ্লয়েড পার্থেনোজেনেসিস হতে দেখা যায়।

Nicotiana tabacum (তামাক) এ অনিষিক্ত শুক্রাণু হতে ভ্রূণ সৃষ্টি হয়। নিষেকক্রিয়া ছাড়া শুক্রাণু থেকে ভ্রূণ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে **অ্যান্ড্রোজেনেসিস** (androgenesis) বলে।

কৃত্রিম পার্থেনোজেনেসিস : বাহ্যিক আবেশের মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে বহু উদ্ভিদে পার্থেনোজেনেসিস ঘটানো সম্ভব। পুংগ্যামিট ডিম্বাণুতে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে এরূপ উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী পদার্থ প্রয়োগ করে নিষেক ছাড়াই ডিম্বাণু থেকে ভ্রূণ উৎপন্ন করা হয়। এক্স-রে প্রয়োগে, ইমাস্কুলেশনের পর পরাগায়ন বিলম্বিত করে বা বেলভিটান জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে কৃত্রিম উপায়ে পার্থেনোজেনেসিস ঘটানো সম্ভব।

পার্থেনোজেনেসিস-এর গুরুত্ব : উদ্ভিদের প্রজননে পার্থেনোজেনেসিস তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেসব উদ্ভিদে পার্থেনোজেনেসিস হতে দেখা যায় (যেমন— *Solanum nigrum, Parthenium argentatum*) তাদের স্বাভাবিক প্রজনন যৌন প্রকার।

- কোনো উদ্ভিদে যদি অযৌন বা যৌন পদ্ধতিতে প্রজনন না ঘটে কেবল পার্থেনোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় নতুন উদ্ভিদের জন্ম হলে ঐ উদ্ভিদের জন্য এ প্রক্রিয়াটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বন্ধ্যাত্বের হাত থেকে বা বিলুপ্তির হাত থেকে প্রজাতিটি রক্ষা পায়।
- এ প্রক্রিয়ায় কোনো প্রকরণ সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে না।
- এ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের সুবিধাজনক মিউটেন্ট বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটতে পারে।
- এ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ ব্রিডিং গবেষণার কাজে লাগানো যায়।

অ্যাপোস্পোরি (Apospory) : ডিম্বকের (ovule) যেকোনো দেহকোষ থেকে (যেমন— ডিম্বক ত্বক, নিউসেলাস) ডিপ্লয়েড ভ্রূণথলি (embryo sac) সৃষ্টি হতে পারে। ডিম্বকের দেহকোষ থেকে সৃষ্ট ডিপ্লয়েড ভ্রূণথলির ডিপ্লয়েড ডিম্বাণুটি হতে নিষেক ছাড়াই ভ্রূণ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বলা হয় **অ্যাপোস্পোরি**। অ্যাপোস্পোরি প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট উদ্ভিদ ডিপ্লয়েড হয় এবং মাতৃউদ্ভিদের সমগুণসম্পন্ন হয়। *Hieracium* উদ্ভিদে এরূপ হতে দেখা যায়।

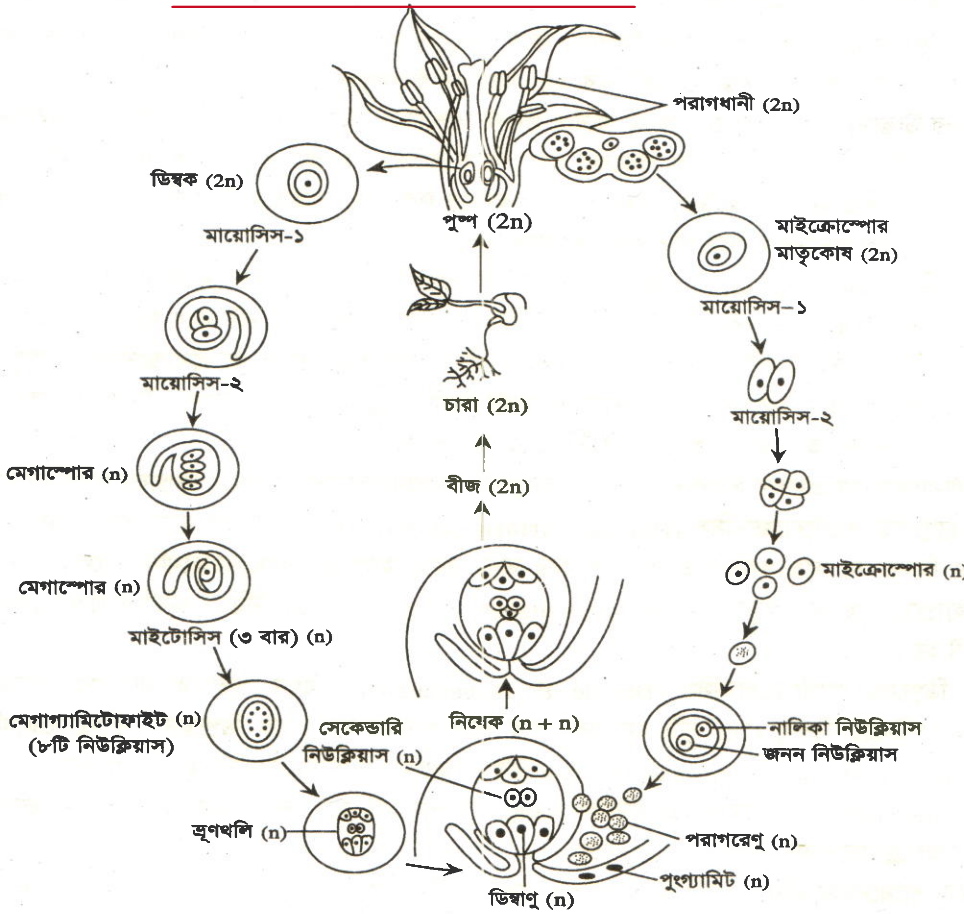

চিত্র ১০.১১ : আবৃতবীজী উদ্ভিদের জীবনচক্রে জনুঃক্রম।

অ্যাডভেনটিটিভ এমব্রায়োনি (Adventitive embryony) : ডিম্বকের ডিম্বক ত্বক বা নিউসেলাসের যেকোনো কোষ হতে ভ্রূণথলি গঠন ছাড়াই (অ্যাপোস্পোরিতে ভ্রূণথলি গঠিত হয়) ভ্রূণ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বলা হয় **অ্যাডভেনটিটিভ এমব্রায়োনি** (adventitive embryony)।

অ্যাপোগ্যামি (Apogamy) : ডিম্বাণু ছাড়া ভ্রূণথলির অন্য যেকোনো কোষ (যেমন- সহকারী কোষ, প্রতিপাদকোষ ইত্যাদি) থেকে ভ্রূণ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে অ্যাপোগ্যামি বলে। এক্ষেত্রে নিষেক ছাড়াই ভ্রূণ সৃষ্টি হয়। *Allium*-এ এরূপ লক্ষ্য করা যায়। [MAT 21-22]

পার্থেনোজেনেসিস, অ্যাপোস্পোরি, অ্যাপোগ্যামি এবং অ্যাডভেনটিটিভ এমব্রায়োনি এর প্রতিটি প্রক্রিয়াতেই নিষেক ছাড়া ভ্রূণ সৃষ্টি হয়। ডিম্বাণু, ভ্রূণথলি বা ডিম্বকের অন্যান্য কোষ থেকে নিষেক ছাড়া ভ্রূণ তৈরির এসব প্রক্রিয়াকে সামগ্রিকভাবে বলা হয় **অ্যাগামোস্পার্মি** (agamospermy)। অ্যাগামোস্পার্মি অনুপ্রেরণা সৃষ্টির জন্য পরাগায়ন আবশ্যকীয় হলে তাকে বলা হয় **সিউডোগ্যামি** (Pseudogamy)। শাঁস তৈরির জন্যই পরাগায়নের প্রয়োজন হয়— ভ্রূণ তৈরির জন্য নয়।

পার্থেনোজেনেসিস ও যৌন প্রজনন এর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	পার্থেনোজেনেসিস	যৌন প্রজনন
১। গ্যামিট	পুংগ্যামিটের প্রয়োজন হয় না।	পুং ও স্ত্রী উভয় গ্যামিটের প্রয়োজন হয়।
২। নিষেক	নিষেকের প্রয়োজন হয় না।	নিষেকের প্রয়োজন হয়।
৩। অপত্য সৃষ্টি	অনিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে সরাসরি পূর্ণাঙ্গ অপত্য জীব সৃষ্টি হয়।	নিষেকের ফলে ডিপ্লয়েড জাইগোট থেকে পরিণত অপত্য জীব সৃষ্টি হয়।
৪। চারিত্রিক গুণাবলি	অপত্যের মধ্যে কেবল মাতার চারিত্রিক গুণাবলি পরিলক্ষিত হয়।	অপত্যের মধ্যে মাতা-পিতার চারিত্রিক গুণাবলি পরিলক্ষিত হয়।

অযৌন প্রজনন ও যৌন প্রজননের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	অযৌন প্রজনন	যৌন প্রজনন
১। গ্যামিট	গ্যামিট সৃষ্টি হয় না এবং গ্যামিটের প্রয়োজন হয় না।	গ্যামিট সৃষ্টি হয় এবং দুটি বিপরীতধর্মী গ্যামিটের মিলন ঘটে।
২। কোষবিভাজন	মায়োসিস কোষ বিভাজনের প্রয়োজন হয় না।	মায়োসিস কোষ বিভাজনের প্রয়োজন হয়।
৩। বৈচিত্র্য	সৃষ্ট নতুন উদ্ভিদে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয় না।	সৃষ্ট নতুন উদ্ভিদে বৈশিষ্ট্যের বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়।
৪। অভিযোজন	সৃষ্ট উদ্ভিদ কম অভিযোজনক্ষম হয়।	সৃষ্ট উদ্ভিদ অধিক অভিযোজনক্ষম হয়।
৫। কোথায় ঘটে	সাধারণত নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদে ঘটে।	নিম্ন ও উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদে ঘটে।
৬। নিষেক	নিষেক ঘটে না।	নিষেক ঘটে।

বাংলাদেশের জাতীয় ফুল সাদা শাপলার মুখ্য প্রজনন প্রক্রিয়া অযৌন। শাপলার ভূনিম্নস্থ প্রধান মৌল কাণ্ড থেকে চারপাশে ছোটো ছোটো **টিউবার (শালুক)** সৃষ্টি হয়। প্রতিটি টিউবার অর্থাৎ শালুক বিচ্ছিন্ন হয়ে পরবর্তীতে অঙ্কুরায়নের মাধ্যমে এক একটি স্বতন্ত্র শাপলা উদ্ভিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। লাল শাপলাতে সাধারণত ফল সৃষ্টি হয় না, এদের প্রজনন সম্পূর্ণ অযৌন।

জাতীয় ফল কাঁঠালের প্রজনন প্রক্রিয়া যৌন প্রক্রিয়া যা বীজ সৃষ্টির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। বীজের অঙ্কুরোদগম মৃৎগত।

জাতীয় বৃক্ষ আম-এর স্বাভাবিক প্রজনন প্রক্রিয়া যৌন প্রক্রিয়া, যা বীজ সৃষ্টির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। তবে পরপরাগায়নের কারণে ফলের স্বকীয় স্বাদ বজায় থাকে না। তাই উদ্যানতত্ত্ববিদ্যায় কাঙ্ক্ষিত বৃক্ষের বংশ বৃদ্ধি ঘটানো হয় কৃত্রিম অঙ্গজ (অযৌন) প্রজনন প্রক্রিয়ায় যা কলম সৃষ্টি বা গ্রাফটিং-এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। বীজের অঙ্কুরোদগম মৃৎগত।

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ **জলজ উদ্ভিদ পদ্ম** অযৌন প্রজনন তথা অসীম বৃদ্ধিসম্পন্ন রানার (রাইজোম কাণ্ড) কাণ্ডের মাধ্যমে অতি দ্রুত বিরাট এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়ে। এদের বীজ অঙ্কুরিত হয়েও স্বতন্ত্র গাছ হতে পারে।

উদ্ভিদের কৃত্রিম প্রজনন (Artificial Reproduction of Plants)

বর্তমানে প্রচলিত ফসল হতে আরো উন্নত বৈশিষ্ট্যের নতুন প্রকরণ উদ্ভাবন প্রক্রিয়াকে সাধারণভাবে ব্রিডিং (breeding) বলা হয়। নির্বাচন (selection), সংকরায়ন (hybridization), মিউটেশন (mutation) ইত্যাদি পদ্ধতির মাধ্যমে ফসলের উন্নত নতুন জাত উদ্ভাবন করা যায়। দুটি বিসদৃশ নির্বাচিত উদ্ভিদের মধ্যে যেখানে প্রাকৃতিক উপায়ে পরাগায়ন ও প্রজনন ঘটানো সম্ভব সেখানে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে পরাগায়ন ঘটিয়ে উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন সাধন করে উন্নত জাত বা প্রকরণ সৃষ্টি করাকে **উদ্ভিদের কৃত্রিম প্রজনন** বলে। এ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট উদ্ভিদকে **সংকর** (hybrid) উদ্ভিদ বলা হয়। উন্নত নতুন ফসল সৃষ্টি প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে **হাইব্রিডাইজেশন** (hybridization) তথা **সংকরায়ন** অন্যতম। প্রকৃতিতে প্রাকৃতিকভাবেও কিছু কিছু হাইব্রিডাইজেশন ঘটে থাকে, তবে সাধারণত কৃত্রিম উপায়েই হাইব্রিডাইজেশন ঘটানো হয়। **সংকরায়ন হলো উদ্ভিদ সুপ্রজননের এমন একটি পদ্ধতি যেখানে এক বা একাধিক জিনগত বৈশিষ্ট্যে ভিন্ন দুই বা ততোধিক উদ্ভিদের মধ্যে ক্রস করিয়ে নতুন ভ্যারাইটি (জাত) উদ্ভাবন করা হয়।**

ভিন্নতর জেনেটিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত দু' বা ততোধিক উদ্ভিদের মধ্যে ক্রস (cross) করানোর প্রক্রিয়াকে বলা হয় কৃত্রিম হাইব্রিডাইজেশন (artificial hybridization) **বা সংকরায়ন**। সাধারণত উন্নত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নতুন প্রকরণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এটি করা হয়।

কৃত্রিম হাইব্রিডাইজেশন (সংকরায়ন) প্রক্রিয়া বা **কৌশল** : কৃত্রিম হাইব্রিডাইজেশন প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ :

১। **প্যারেন্ট নির্বাচন :** কাদের মধ্যে হাইব্রিডাইজেশন করতে হবে তা নির্বাচন করাই হলো প্যারেন্ট নির্বাচন।

২। **প্যারেন্টের কৃত্রিম স্বপরাগায়ন :** প্যারেন্ট স্বপরাগী না হলে এদেরকে কৃত্রিম স্বপরাগায়নের মাধ্যমে হোমোজাইগাস (homozygous) করা হয়।

৩। **প্যারেন্ট উদ্ভিদের ইমাস্কুলেশন :** যে পুষ্পকে মাতৃপুষ্প হিসেবে ধরা হবে তা যদি উভলিঙ্গ (এবং স্বপরাগী হয় অথবা প্রয়োজনে স্বপরাগী হতে পারে) হয় তাহলে ইমাস্কুলেশন করা হয়। **পরিপক্ব হবার আগেই পুষ্প থেকে পুংকেশর মেরে ফেলা বা সরিয়ে ফেলাকে বলা হয় ইমাস্কুলেশন**। এতে করে স্বপরাগায়ন ঘটতে পারে না।

৪। **ব্যাগিং :** পলিথিন ব্যাগের সাহায্যে ক্রসে ব্যবহারের জন্য নির্বাচিত উদ্ভিদের পুষ্পিত অংশকে ঢেকে দেওয়া হয়।

৫। **ক্রসিং :** ব্যাগিং করা পুং উদ্ভিদ হতে পুংরেণু সংগ্রহ করে ব্যাগিং করা স্ত্রী উদ্ভিদের ইমাস্কুলেটেড পুষ্পের গর্ভমুণ্ডে ফেলা হয়।

৬। **লেবেলিং :** ইমাস্কুলেশনের তারিখ, ক্রসিং-এর তারিখ, মাতৃ ও পিতৃউদ্ভিদ পরিচিতি সম্বলিত একটি লেবেল স্ত্রী উদ্ভিদে লাগিয়ে দেয়া হয়।

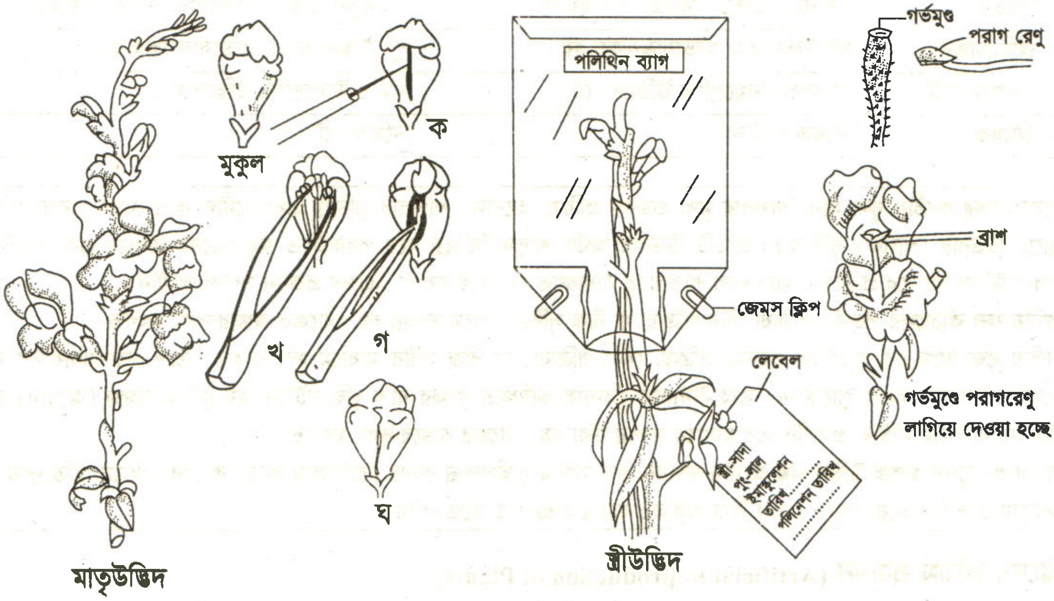

চিত্র ১০.১২ : ক্রসিং-এর বিভিন্ন পর্যায় (ক-ঘ ইমাস্কুলেশন) বা সংকরায়ন।

৭। **বীজ সংগ্রহ :** কৃত্রিম পরাগায়নের ফলে সৃষ্ট ফলটি পাকলে তা থেকে বীজ সংগ্রহ করা হয়।

৮। **বীজ বপন ও F_1 উদ্ভিদের উদ্ভব :** পরবর্তী বছর কৃত্রিম ক্রসের ফলে সৃষ্ট বীজগুলো বপন করা হয় এবং F_1-বংশধর সৃষ্টি হয়। F_1-বংশধরগুলো হলো নির্বাচিত প্যারেন্টের হাইব্রিড। পরে F_2 .....F_6 পর্যন্ত বংশধর সৃষ্টি করে উন্নত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নতুন প্রকরণ সৃষ্টি করা হয়।

৯। **F_1 বংশধরের ব্যবহার ও নতুন প্রকরণ সৃষ্টি :** F_1 বংশধরের দুটি উদ্ভিদের মধ্যে ক্রস করিয়ে যেসব উদ্ভিদের সৃষ্টি হয় সেগুলো হলো F_2 বংশধর। একই পদ্ধতিতে কয়েক প্রজন্ম (generation) ধরে এভাবে সংকরায়ন করতে করতে একটি নতুন প্রকরণের জন্ম হয়।

প্রকৃতপক্ষে ৩ হতে ৬ নম্বর ধারাকে মিলিতভাবে কৃত্রিম প্রজননের কলাকৌশল বলা হয়।

RMDAC

সংকরায়ন পদ্ধতির সতর্কতা (Precaution)

১। প্যারেন্ট নির্বাচন করার সময় তাদের পার্থক্যগুলো সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করতে হয়।
২। ইমাস্কুলেশন ও পরাগায়নের সময় হাত, সূঁচ, চিমটা, তুলি প্রভৃতি স্পিরিট দিয়ে ধুয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হয়।
৩। লক্ষ্য রাখতে হবে, ইমাস্কুলেশনের সময় যেন একটি পুংকেশরও থেকে না যায় এবং গর্ভকেশরের যেন কোনো ক্ষতি না হয়।
৪। ব্যাগিং ঠিকমতো করতে হবে এবং এর মধ্যে বায়ু প্রবেশের জন্য সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকতে হবে।
৫। সংকর বীজ সংগ্রহ এবং এক্ষেত্রে কলা-কৌশল গ্রহণ সঠিকভাবে নিতে হবে।

বিবর্তনে কৃত্রিম প্রজননের ভূমিকা

উদ্ভিদ বিবর্তনে কৃত্রিম প্রজননের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। নিম্নে কৃত্রিম প্রজননের ভূমিকা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো :

ভ্যারিয়েশন সৃষ্টি : বিবর্তনের আধুনিক ধারণা মতে মিউটেশন, ক্রোমোসোমীয় মিউটেশন, জেনেটিক রিকম্বিনেশন, প্রজাতি বৈচিত্র্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ফলে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উন্নত গুণসম্পন্ন নতুন নতুন প্রজাতি তৈরি হয় যার মাধ্যমে ভ্যারিয়েশন (বৈচিত্র্যের) সৃষ্টি হয়।

প্রতিকূলতা সহিষ্ণু জাত তৈরি : কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে বন্যা, খরা, লবণাক্ততা প্রতিরোধক্ষম জাত তৈরি করা যায়। এ জাত নতুন পরিবেশের সাথে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

রোগ প্রতিরোধী জাত তৈরি : শস্যের সর্বোচ্চ ফলনের প্রধান সমস্যা হলো রোগ ও কীট-পতঙ্গের আক্রমণ। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমের বিভিন্ন ফসলের রোগ প্রতিরোধী জাত তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে। BRRI উদ্ভাবিত মুক্তা (বিআর-১০), গাজী (বিআর-১৪), মোহিনী (বিআর-১৫)। এগুলো রোগ প্রতিরোধী জাত। [DAT, 21-22]

গুণগত মান উন্নয়ন : খাদ্যশস্যর ক্ষেত্রে দানার আকার, বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ, দীর্ঘ সংরক্ষণ সময় ইত্যাদি উন্নত বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে এসব বৈশিষ্ট্য স্থানান্তর করে উদ্ভিদের গুণগত মান উন্নয়ন করা যায়।

আবাদকাল সংক্ষিপ্তকরণ : বন্যার কারণে অনেক নিম্নভূমির আবাদ নষ্ট হয়ে যায়। আবার ঝড়ের প্রকোপেও অনেক ফসল নষ্ট হয়। কৃত্রিম সংকরায়নের মাধ্যমে ফসলের আবাদকাল ২০–৩০ দিন পর্যন্ত কমানো সম্ভব। এতে বন্যার পূর্বেই ফসল সংগ্রহ করা যাবে।

কৃত্রিম প্রজননের অর্থনৈতিক গুরুত্ব : কৃত্রিম প্রজননের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। এর মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছে ফসলের অসংখ্য উন্নত ফলনশীল জাত। উন্নত ফলনশীল প্রকরণগুলোর অধিকাংশই আবার রোগ ও ক্ষরা প্রতিরোধক্ষম। প্রতি বছর পৃথিবীতে উন্নত ফলনশীল প্রকরণগুলোর কারণে লক্ষ লক্ষ টন ফলন বেড়ে চলেছে। সংক্ষিপ্ত আকারে কৃত্রিম প্রজননের গুরুত্ব নিম্নরূপ :

(১) উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন, (২) রোগ প্রতিরোধক্ষম জাত উদ্ভাবন, (৩) প্রতিকূল পরিবেশে অভিযোজনক্ষম জাত উদ্ভাবন, (৪) উচ্চফলনশীল হাইব্রিড উদ্ভাবন, (৫) দৃষ্টিনন্দন অর্কিড উদ্ভাবন, (৬) দৃষ্টিনন্দন গোলাপ উদ্ভাবন, (৭) নতুন প্রজাতি উদ্ভাবন, (৮) বীজহীন ফলের জাত উদ্ভাবন, (৯) অধিক ফলনশীল শাক-সবজির জাত উদ্ভাবন এবং (১০) প্রাণীর কৃত্রিম প্রজননে বহু উন্নত জাত উদ্ভাবন। নিম্নে কৃত্রিম প্রজননের কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো :

☐ **উচ্চফলনশীল ধানের জাত সৃষ্টি :** ১৯৬০ এর দশকে ফিলিপিনসে অবস্থিত আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা কেন্দ্রের (**IRRI**-International Rice Research Institute) বিজ্ঞানিগণ **ইরি** ধান উদ্ভাবন করেন। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল ধান ইরি-২০, ইরি-৮, ইরি-৫, ইরি-২৮, ইরি-২৯ ইত্যাদি। একরপ্রতি এদের ফলন বেড়েছে বহুগুণ। বাংলাদেশ ধান গবেষণা কেন্দ্রে (**BRRI**-Bangladesh Rice Research Institute) উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল ধান চান্দিনা, বিরিশাইল, ইরিশাইল ইত্যাদির ফলনও অনেক বেশি। বাংলাদেশ ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত চারটি উফশী জাতের নাম হলো- চান্দিনা (বিআর-১), মালা (বিআর-২), শাহী বালাম (বিআর-১৫) এবং শ্রাবনী (বিআর-২৬)। গত ৪০ বছরে এশিয়ায় ধানের উৎপাদন কমপক্ষে ৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

অধিক ফলনশীল ইরি বা বিরি ধান উদ্ভাবনের আগে পৃথিবীর এ অঞ্চলে, বিশেষ করে আজকের বাংলাদেশ অঞ্চলে কয়েক বছর পর পরই দুর্ভিক্ষ দেখা দিতো, অথচ তখন লোকসংখ্যা ছিল আজকের তুলনায় অনেক কম এবং ধান চাষের জমিও ছিল অনেক বেশি। এর প্রধান কারণ হলো তখন ধানের ফলন একরপ্রতি খুবই কম ছিল, ফলে কোনো বছর আগাম বন্যা বা খরা দেখা দিলেই দুর্ভিক্ষ দেখা দিতো। তখনকার সময়ে চাষকৃত জাতগুলোর একরপ্রতি সর্বাধিক ফলন ছিল ৩০–৩৫ মণ। বর্তমানে চাষকৃত উচ্চফলনশীল জাতের একরপ্রতি সর্বাধিক ফলন হয় ৭০–৯০ মণ।

ইরি–৮, ইরি–৫, ইরিশাইল এগুলো উচ্চফলনশীল ধানের জাত। ইন্দোনেশিয়ান পেটাধান ও তাইওয়ানের ডি. জি. উজেন ধানের মধ্যে সংকরায়ন করে উদ্ভাবন করা হয়েছে **ইরি–৮**। এর একরপ্রতি ফলন ৯০–১০০ মণ। ইরি–৫ উদ্ভাবন করা হয়েছে ইন্দোনেশিয়ান পেটা ধান ও টোংকাই ধান এর সংকর করে। **ইরি–৫** এর ফলন একরপ্রতি ৭০–৭৫ মণ। বাংলাদেশে উদ্ভাবিত ইরিশাইল উদ্ভাবন করা হয়েছে ইন্দোনেশিয়ান পেটাধান, ভারতের টি. কে. এম-৬ ধান এবং তাইওয়ানের টাইচু–১ এর মধ্যে সংকর করে। এর একরপ্রতি ফলন ৭০–৭৫ মণ। এমনিভাবে বিআর–২০ এবং বিআর–৩ এর মধ্যে সংকরায়ন করে উদ্ভাবন করা হয়েছে **বিরিশাইল**। বিআর-২৮ এবং বিআর-২৯ আরও উন্নত জাত।

কৃষকের কাছে বোরো মৌসুমে চাষের জন্য সবচেয়ে প্রিয় ধান ব্রি-২৮ এবং ব্রি-২৯। ব্রি-২৯ এর চাল সরু এবং লম্বা। সম্প্রতিকালে এ জাত দু'টির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গিয়েছে এবং সহজেই ব্লাস্ট রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। তাই গত ১৬/৫/২০২৩ তারিখের কৃষি মন্ত্রণালয়ের এক সভায় এ জাত দু'টিকে ধীরে ধীরে প্রত্যাহার করে নিতে সুপারিশ করা হয়েছে।

ব্রি-২৮ এর বিকল্প হিসেবে ব্রি-৬৮, ৮১, ৮৬, ৮৮, ৯৬, ১০১, ১০৫ এবং বঙ্গবন্ধু-১০০ আবাদ করা যেতে পারে। ব্রি-২৯ এর বিকল্প হিসেবে ব্রি-৮৯, ৯২, ৯৭, ৯১, ১০২, বঙ্গবন্ধু-১০০, বিনা-২৫; লবণাক্ত এলাকায় বিনা-১০ চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করতে বলা হয়েছে।

❑ **উচ্চফলনশীল গমের জাত তৈরি :** বর্তমানে বিশ্বব্যাপী চাষকৃত গমও কৃত্রিম প্রজননের ফসল। আগে গমের ফলন হতো খুবই কম। তাছাড়া বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায়ই ফসল নষ্ট হয়ে যেতো। ফসল রক্ষার জন্য তখন লক্ষ লক্ষ ডলারের ওষুধ প্রয়োগ করতে হতো। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উদ্ভাবিত বর্তমান গমের ফলনও বেশি। আবার রোগ প্রতিরোধক্ষম হওয়ায় ওষুধ প্রয়োগের তেমন প্রয়োজন হয় না। এর ফলে খরচ কম হয়, অথচ ফসল বেশি পাওয়া যায়।

অনেক আগে যে গমের চাষ হতো তার ফলন ছিল খুবই কম, তাছাড়া এর রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও ছিল কম। বিভিন্ন জাতের মধ্যে সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে উন্নতজাতের গম, যা বর্তমানে বিশ্বব্যাপী চাষ করা হয়। **মেক্সিকোর (CIMMIT)** সহযোগিতায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI) ১৭ জাতের উফশী গম উদ্ভাবন করেছে। এসব জাতের মধ্যে বলাকা, কাঞ্চন, আনন্দ, আকবর, বরকত ও সওগাত বেশ জনপ্রিয় জাত। উচ্চফলনশীল গম উদ্ভাবনের জন্য আমেরিকান বিজ্ঞানী Norman Earnest Borlaug ১৯৭০ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

❑ **উন্নত জাতের ভুট্টা উৎপাদন :** আমেরিকার বিজ্ঞানী G. H. Shull ১৯০৮ সালে ভুট্টার সংকর উদ্ভিদ সৃষ্টির মাধ্যমে ভুট্টার দানা উৎপাদনে দারুণভাবে সফল হন। এরপর ভুট্টার দ্বি-সংকর পদ্ধতিতে এর উৎপাদন আরও বাড়ানো হয়েছে।

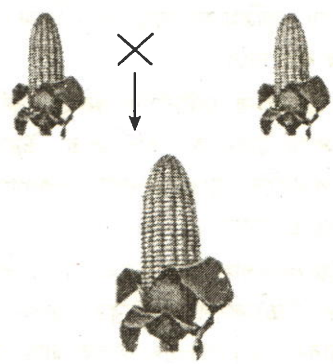

চিত্র ১০.১৩ : হাইব্রিড ভুট্টার সৃষ্টি।

❑ **উন্নত জাতের ফুল ও অর্কিড উৎপাদন :** বর্তমান সময়ে চাষকৃত অধিকাংশ ফুলই সংকরায়নের মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রতি বছর বহু অর্কিড সৃষ্টি করা হচ্ছে সংকরায়নের মাধ্যমে। কৃত্রিম সংকরায়নের মাধ্যমে যে জাত তৈরি হচ্ছে তার ফলে ফুল চাষে বিপ্লব ঘটছে। যেমন— গোলাপের হাইব্রিড-টি, ফ্লোরিবান্ডা, মেরিগোল্ড, গ্ল্যাডিওলাস, রজনীগন্ধা ইত্যাদি প্রায় সব জাতই হাইব্রিড।

❑ **হাইব্রিড ফল ও সবজি উৎপাদন :** কৃত্রিম হাইব্রিডাইজেশনের মাধ্যমে আম, তরমুজ, আপেল, বরই ইত্যাদি ফল এবং মিষ্টি কুমড়া, লাউ, টমেটো, ঝিঙা, বাঁধাকপি ইত্যাদি সবজি উৎপাদন করে বাজারজাত করা হচ্ছে। বীজহীন ফল ও সবজি কৃত্রিম প্রজননের সুফল।

❑ **রোগ প্রতিরোধী জাত উৎপাদন :** বিভিন্ন রোগ সংক্রমণের ফলে প্রচুর পরিমাণে আবাদি ফসলের ফলনহানী হয়ে থাকে। বুনো প্রজাতির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি হওয়ায় সংকরায়নের মাধ্যমে এ বৈশিষ্ট্য আবাদি জাতে কৃত্রিমভাবে স্থানান্তরের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধী জাত উৎপাদন করা সম্ভব। BRRI উদ্ভাবিত মুক্তা (BR-10), গাজী (BR-14), মোহিনী (BR-15), শাহী বালাম (BR-16) প্রভৃতি ধানের রোগ প্রতিরোধী জাত।

❑ **প্রতিকূল সহিষ্ণুতা :** ফসল ও স্থানভেদে কোনো কোনো ফসলের অতিবৃষ্টি, খরা, শীত প্রভৃতি এক বা একাধিক প্রতিকূলতা প্রতিরোধী জাতে সৃষ্টির আবশ্যকতা দেখা দেয়। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে এটি করা সম্ভব।

❑ **অধিক অভিযোজন ক্ষমতা :** কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে সৃষ্টি করা উদ্ভিদের অভিযোজন ক্ষমতা বেশি থাকায় এরা বিচিত্র আবহাওয়া ও জলবায়ুতে জন্মাতে সক্ষম।

❑ **বীজ ঝরে পড়া স্বভাবের পরিবর্তন :** ফসল সংগ্রহের আগে মাঠ পর্যায়ে কোনো শস্যের ফল থেকে বীজ ঝরে যেতে থাকে তবে তা ফলনকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে। এটা মুগ ডালজাতীয় উদ্ভিদে দেখা যায়। এ বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন করা একান্ত দরকার।

❑ **একই সময়ে পরিপক্বতা :** একই শস্য ক্ষেত থেকে একাধিকবার ফসল সংগ্রহের জন্য বেশি পরিশ্রম ও অর্থের দরকার। একই সময় পরিপক্ব হয় সেরূপ শস্য উদ্ভাবন করা দরকার। এটি কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে সম্ভব।

❑ **উদ্ভিদ বিবর্তনে :** কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতির মাধ্যমে নতুন প্রজাতির উদ্ভিদ সৃষ্টি করা যায়। বিবর্তনের আধুনিক ধারণা অনুযায়ী জিন মিউটেশন, ক্রোমোসোমীয় মিউটেশন ও জেনেটিক রিকম্বিনেশন নির্বাচন হলো প্রজাতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

❑ অধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধান উদ্ভাবন করেন ড. ইউয়ান লংপিং। এখন বহু কৃষক অধিক ফলনশীল হাইব্রিড বীজ চাষ করেন।

সার-সংক্ষেপ

প্রজনন : জীব থেকে নতুন শিশু জীব সৃষ্টি প্রক্রিয়াই প্রজনন। প্রজনন জীবের অনন্য বৈশিষ্ট্য। মাতৃউদ্ভিদ থেকে নতুন শিশু উদ্ভিদসৃষ্টির প্রক্রিয়া হলো উদ্ভিদ প্রজনন। উদ্ভিদ বিভিন্ন উপায়ে প্রজনন করতে পারে। উপায়গুলো হলো— অঙ্গজ জনন, যৌন জনন, পার্থেনোকার্পিক জনন। মূল ও কাণ্ডের বিভিন্ন উপবৃদ্ধি থেকে যে জনন হয় তা হলো অঙ্গজ জনন। ফুল সৃষ্টির মাধ্যমে যে প্রজনন হয় তা হলো যৌন প্রজনন। ফুল থেকে বীজ হয়, তাই বীজ দ্বারা যে প্রজনন হয় তা যৌন প্রজনন।

নিষেক : নিশ্চল স্ত্রীগ্যামিটের সাথে সচল পুংগ্যামিটের মিলনকে নিষেক বা নিষেকক্রিয়া বলা হয়। নিষেক ক্রিয়ার প্রথম ধাপ হলো পরাগায়ন। পরাগায়নের মাধ্যমে একই উদ্ভিদের অথবা একই প্রজাতির অন্য উদ্ভিদের পরাগধানী হতে পরাগরেণু ফুলের গর্ভমুণ্ডে পতিত হয়। গর্ভমুণ্ডে পতিত হওয়ার পর পরাগরেণু পরাগনালিকা সৃষ্টির মাধ্যমে অঙ্কুরিত হয়। পরাগনালিকা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে গর্ভদণ্ড পার হয়ে গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে। ইতোমধ্যে পরাগনালিকার ভেতরে শুক্রাণু সৃষ্টি হয়। পরাগনালিকা শেষ পর্যন্ত ভ্রূণথলিতে প্রবেশ করে। শুক্রাণু ভ্রূণথলিস্থ ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়ে নিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করে। একই সময়ে অপর একটি শুক্রাণু ভ্রূণথলিতে অবস্থিত সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হয়ে দ্বিনিষেক সম্পন্ন করে। নিষেকের পর নিষিক্ত ডিম্বাণু পরিপূর্ণ হয়ে বীজে পরিণত হয়।

সংকরায়ন : কোনো ভালো বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন গাছের পরাগরেণু একই প্রজাতির ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন গাছের গর্ভমুণ্ডে পরাগায়ন ঘটিয়ে উন্নত জাত উদ্ভাবনের প্রক্রিয়াকে বলা হয় সংকরায়ন (hybridization)। অন্যভাবে বলা যায়, সংকরায়ন হলো এমন প্রজনন পদ্ধতি যেখানে এক বা একাধিক জিনগত বৈশিষ্ট্যে ভিন্ন দুই বা ততোধিক উদ্ভিদের মধ্যে ক্রস করিয়ে নতুন উন্নত ভ্যারাইটি (জাত) উদ্ভাবন করা হয়। একটি নাতিদীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এটি করা হয়। ধানের ইরি বা বিরি-র বিভিন্ন উন্নত ফলনশীল প্রকরণ এভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

এই অধ্যায়ে দক্ষতা অর্জন

১। যে শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় জীব তার অনুরূপ অপত্য বংশধর সৃষ্টি করে তাই **প্রজনন** বা প্রজনন প্রক্রিয়া। অপত্য বংশধর সৃষ্টি করাই প্রজনন। প্রজনন জীবের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

২। প্রজনন প্রক্রিয়া প্রধানত তিন প্রকার। যথা– (i) **যৌন প্রজনন**, (ii) **অযৌন প্রজনন এবং** (iii) **পার্থেনোজেনেসিস**।

৩। আবৃতবীজী উদ্ভিদ-এর যৌন প্রজনন অঙ্গ হলো ফুল।

৪। উদ্ভিদের যৌন প্রজননের জন্য বিশেষভাবে রূপান্তরিত **বিটপই** ফুল।

৫। ফুলের পুংকেশরে পরাগধানী থাকে। পরাগধানীর অভ্যন্তরে পরাগমাতৃকোষের মায়োসিস বিভাজনে সৃষ্ট হ্যাপ্লয়েড কোষই **পরাগরেণু**।

৬। সাধারণত চারটি পরাগরেণু হালকাভাবে এক সাথে অবস্থান করে। এ অবস্থায় একে **পরাগচতুষ্টয় বা পোলেন টেট্রাড** বলে।

৭। একটি পরাগধানীর পরাগরেণুসমূহ একসাথে গুচ্ছবদ্ধভাবে অবস্থান করলে সেই পরাগগুচ্ছকে **পলিনিয়াম** বলে। Orchidaceae, Asclepiadaceae গোত্রে পলিনিয়াম দেখা যায়।

৮। পরাগরেণুর বাইরের ত্বকে (এক্সাইন) থাকা ছিদ্রকে **জার্মপোর, রেণুরন্ধ্র**, বা **জনন** ছিদ্র বলে।

৯। পরাগরেণু হলো পুংগ্যামিটোফাইটের প্রথম কোষ।

১০। পরাগনালিকাতে দুটি পুংগ্যামিট সৃষ্টি হয়।

১১। ডিম্বকের অগ্রভাগের ত্বকবিহীন অংশকে **মাইক্রোপাইল** বা **ডিম্বকরন্ধ্র** বলে।

১২। ডিম্বক প্রধানত চার প্রকার। (i) ঊর্ধ্বমুখী, (ii) অধোমুখী, (iii) পার্শ্বমুখী এবং (iv) বক্রমুখী।

১৩। ডিম্বক ত্বক দিয়ে আবৃত টিস্যুই **নিউসেলাস** বা **ভ্রূণপোষক** টিস্যু।

১৪। ডিম্বকের নিউসেলাসে সৃষ্ট থলির ন্যায় অঙ্গকে **ভ্রূণথলি** বলা হয়।

১৫। মেগাস্পোর বা স্ত্রীরেণু হলো স্ত্রী গ্যামিটোফাইটের প্রথম কোষ।

১৬। শতকরা ৭৫ ভাগ উদ্ভিদে মনোস্পোরিক প্রক্রিয়ায় ভ্রূণথলি গঠিত হয়। মনোস্পোরিক-এ একটি মাত্র স্ত্রীরেণু ভ্রূণথলি গঠনে অংশগ্রহণ করে।

১৭। **দ্বিনিষেক :** একই সময়ে ডিম্বাণুর সাথে একটি পুংগ্যামিটের মিলন ও সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে অপর পুংগ্যামিটের মিলন প্রক্রিয়াকে দ্বিনিষেক বলা হয়। দ্বিনিষেক আবৃতবীজী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য।

১৮। **ত্রিমিলন** (Triple fusion) : সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে একটি পুংগ্যামিটের মিলনকে ত্রিমিলন বলে। মিলনের ফলে **ট্রিপ্লয়েড** অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং তা থেকে **সস্যকলা** সৃষ্টি হয়।

১৯। নগ্নবীজী *Ephedea*-তে দ্বিনিষেক আবিষ্কৃত হয়েছে।

২০। নিষেকের পর পূর্ণতাপ্রাপ্ত ও বিকশিত গর্ভাশয়ই ফল।

২১। নিষেকের পর বিকশিত ডিম্বকই বীজ।

২২। যে প্রক্রিয়ায় ডিম্বাণু নিষেক ছাড়াই ভ্রূণে পরিণত হয় এবং ডিম্বক বীজে পরিণত হয় তাকে **পার্থেনোজেনেসিস** বলে।

২৩। হরমোন প্রয়োগে বীজহীন ফল সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে **পার্থেনোকার্পি** বলে।

২৪। ডিম্বকের দেহকোষ থেকে সৃষ্ট ভ্রূণথলির (ডিপ্লয়েড) ডিপ্লয়েড ডিম্বাণুটি নিষেক ছাড়াই ভ্রূণ সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে **অ্যাপোস্পোরি** বলা হয়।

২৫। ডিম্বাণু ছাড়া ভ্রূণথলির অন্য যেকোনো কোষ থেকে ভ্রূণ সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে **অ্যাপোগ্যামি** বলে।

২৬। এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যে ভিন্নতর দুটি (বা ততোধিক) উদ্ভিদের মধ্যে কৃত্রিমভাবে ক্রস করানো প্রক্রিয়াকে বলা হয় **হাইব্রিডাইজেশন** বা **সংকরায়ন**। সংকরায়নের মাধ্যমে সৃষ্ট উদ্ভিদকে বলা হয় **সংকর উদ্ভিদ**।

২৭। IRRI-International Rice Research Institute (ফিলিপাইন-এ)

২৮। BRRI-Bangladesh Rice Research Institute (জয়দেবপুর, বাংলাদেশ)

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ)

১। নিষেকের পর ডিম্বাণু কিসে পরিণত হয়?

(ক) ভ্রূণ (খ) বীজ (গ) ফল (ঘ) সস্য

২। স্ত্রীগ্যামিটোফাইটের পূর্ণাঙ্গ ভ্রূণ থলিতে থাকে—

(i) ডিম্বাণুযন্ত্র

(ii) প্রতিপাদ নিউক্লিয়াস

(iii) ট্রিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকের চিত্রটি দেখে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

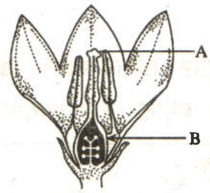

ফুলের লম্বচ্ছেদ

৩। উদ্দীপকের A চিত্রটির বৈশিষ্ট্য হলো–

(i) পরাগ মাতৃকোষ ধারণ করে (ii) কীট-পতঙ্গকে আকৃষ্ট করে (iii) পরাগরেণু তৈরি করে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। নিষেকের পর চিত্রের B অংশটি কিসে পরিণত হয়?

(ক) ফলে (খ) বোঁটায় (গ) সস্য (ঘ) নষ্ট হয়ে যায়

বহুনির্বাচনি প্রশ্নাবলির উত্তরমালা :

১। (ক)	২। (ক)	৩। (খ)	৪। (ক)

সৃজনশীল প্রশ্নের (CQ) নমুনা

১। পাশের চিত্রটি লক্ষ্য করো এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

(ক) দ্বি-নিষেক কী?

(খ) ইমাস্কুলেশন ব্যাখ্যা করো।

(গ) উদ্দীপকের B চিত্রটি কীভাবে পুংগ্যামিট তৈরি করে?

(ঘ) চিত্র-B এর কী কী পরিবর্তনের মাধ্যমে চিত্র-A তৈরি হয় আলোচনা করো।

চিত্র –A

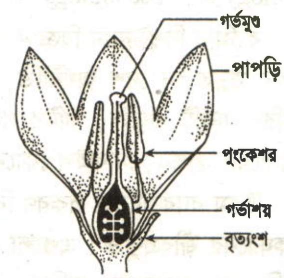

চিত্র –B

২। পাশের চিত্রটি লক্ষ্য করো এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

(ক) Chalazogamy কী?

(খ) দ্বি-নিষেক বলতে কী বুঝ?

(গ) উদ্দীপকে চিহ্নিত A সৃষ্টির প্রক্রিয়া বর্ণনা করো।

(ঘ) A ব্যতীত উচ্চশ্রেণির জীবে জনুক্রম অসম্ভব—ব্যাখ্যা করো।

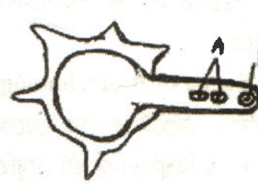

৩। পাশের চিত্রটি লক্ষ্য করো এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

(ক) Porogamy কী?

(খ) একটি আদর্শ ডিম্বকের গঠন বর্ণনা দাও।

(গ) উদ্দীপকে বর্ণিত প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করো।

(ঘ) উক্ত প্রক্রিয়া ব্যতীত আবৃতবীজী উদ্ভিদের যৌনজনন অসম্ভব—ব্যাখ্যা করো।